রাখিত ; সুউচ্চ দেবদারু গাছগুলি আকাশে মাথা তুলিয়া প্রেতের মত কত আতঙ্কেরই সৃষ্টি করিত। আজ তাহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং সেই শষ্পাচ্ছন্ন সুবিস্তীর্ণ ভূভাগটি ব্যাপিয়া কি মনোরম স্বপ্নপুরীই রচিত হইয়াছে,— সারিসারি বাংলোগুলির আলোকোজ্জ্বল হল হইতে পিয়ানোর মধুর-স্বর ঝঙ্কার তুলিয়া পথচারীদের চিত্তেও চাঞ্চল্যের কি শিহরণ তুলে !

কলের জল, বিজলীর আলো, পীচ-ঢালা রাস্তা, সিনেমা, বাজার, অসংখ্য দোকানপাট, কেতাদুরস্ত পাঠাগার, হাইস্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি আধুনিক যাবতীয় রূপসজ্জায় সজ্জিত হইয়া সহরতলীর এই সমৃদ্ধ অঞ্চলটি সকল রকমেই যেন সহরের সহিত টেক্কা দিয়া চলিয়াছে।

আবার, ওদিকেও স্বার্থগত প্রতিপত্তি লইয়া দুই ভূস্বামীর মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে রেষারেষি চলিয়া আসিতেছে, তাহার গুরুত্বও অস্বীকার করা চলে না। স্থানীয় মুখুজ্জ্যে বাবুরা পুরুষানুক্রমে যদিও এই অঞ্চলের [illegible] প্রতিপত্তিশালী ভূস্বামী এবং ইহার অধিকাংশই তাঁহাদের আয়ত্তাধীন বাকড়া এষ্টেটের অন্তর্গত, কিন্তু ইহার ভিতরেও দেবীপুরের রাজাদের যে নিষ্কর সম্পত্তি বিদ্যমান ; তাহার পরিমাণও সামান্য নহে। ভিন্ন সরকারের এই সম্পত্তি ও সেইসূত্রে তাঁহাদেরই তালুকের

মধ্যে দেবীপুরের প্রতিপত্তি মুখুজ্জ্যেবাবুদিগকে নিদারুণ বেদনা দিয়া আসিতেছে।

একটা প্রবচন প্রচলিত আছে,—এক কম্বলে দশ দরবেশ অনায়াসে বসিতে পারে, কিন্তু একটা অঞ্চলে দুই মালিক স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না। এই প্রবাদ-বাক্যটী এখানে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

নিজেদের এলাকায় অন্য এষ্টেটের দপদপা দেখিয়া এখানকার বাবুরা ভাবেন, যেন তাঁহাদের বুকের উপর বাঁশগাড়ী চাপাইয়া দেবীপুরের রাজাবাবুরা হাতুড়ি পিটিতেছে! প্রজারাও মজা পাইয়াছে, পূর্ব্বের মত আর মানিতে চাহেনা, কথায় কথায় দল পাকায়, দেবীপুরের নজীর দেখাইয়া নানারূপ সংস্কার দাবী করে।

এখানকার বাবুদের এই ভাবনাটি যে একেবারে নিরর্থক, তাহা নহে। এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে—পুরুষ-পরম্পরায় বাকড়া এষ্টেটের বাবুরা যে পরিমাণে দাম্ভিক, প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল ও প্রজাশাসনে সিদ্ধহস্ত; দেবীপুরের তরফ সকল দিক দিয়া এগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই অঞ্চলে তাঁহাদের নিজস্ব যে সকল প্রজা আছে, সংখ্যায় তাহারা পরিমিত হইলেও, তাহাদের সুখ, সুবিধা ও উন্নতির দিকে এই সরকারের অপরিমিত প্রয়াস ও ব্যয় বাহুল্য

সর্ব্বসাধারণকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছে। ইঁহাদেরই সুযোগ সুবিধার অনুরোধে উপরপড়া হইয়া দেবীপুর সরকার এ অঞ্চলে যে সকল বহুব্যয়সাধ্য লোকহিতকর সার্ব্বজনীন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া দিয়াছেন, সেগুলিও অল্প বিস্ময়াবহ নহে। ইহাতে দেবীপুর রাজের প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা মূর্ত্ত হইবারই কথা। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভিন্ন ভূস্বামীর উদ্দেশে জনসাধারণের এই শ্রদ্ধার উচ্ছ্বাস বাকড়ার বাবুরা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারেন না।

এই সূত্রে প্রজা-পক্ষকে উপলক্ষ করিয়া রাজস্থানীয় দুই পক্ষের মধ্যে কত মামলা মকদ্দমাই বাধিয়াছে এবং তাহাদের বিবরণ নিম্ন ও উচ্চ আদালতসমূহের নথীভুক্ত হইয়া আছে। সেই সকল মামলায় কখনও দেবীপুরের রাজারা জয়ী হইয়াছেন, কখনও বা বাকড়ার বাবুরা বিজয়-তিলকে ললাটের শোভা বাড়াইবার গৌরব অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত লাভবান তাহাতে কোনও পক্ষই হইতে পারেন নাই; জয়-পরাজয় উভয় পক্ষকেই অপব্যয় ও অসুবিধার ভিতর দিয়া বরাবরই ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে এই দুই সরকারের বিবাদের ইতিহাস যদি আলোচনা করা যায়, তাহাতে ইহাই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে, প্রতিবারই বাকড়ার বাবুরা বিরোধী পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ইট ছুঁড়িয়াছেন,

অজানা অতিথি

অপর পক্ষ অবশ্য অহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া নিক্ষিপ্ত ইট মাথা পাতিয়া লন নাই, প্রতিরোধ করিয়াছেন এবং সময় বিশেষে মৃজাপুরী পাথর ফেলিয়া পাল্টা জবাব দিয়াছেন।

বাকড়া এষ্টেটের বর্ত্তমান মালিক ভূপতি বাবুই সর্ব্বপ্রথম এই হঠকারীতামূলক অবস্থাটা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিলেন। তিনি যেমন বিচক্ষণ, তেমনই দূরদর্শী। নিজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থাটা প্রবল প্রতাপ ব্রিটিশ-সরকারের অনুরূপ অবস্থার সহিত মনে মনে মিলাইয়া কতকটা আশ্বস্ত হইলেন। বুঝিলেন যে, অবস্থা উভয়েরই সমান সমান। ব্রিটিশ-সরকারের সসাগরা বিশাল তালুকের মধ্যে ফরাসী সরকারের কিঞ্চিৎ সম্পত্তির সমাবেশ মধ্যে মধ্যে কিরূপ অনর্থ ও অসুবিধার সৃষ্টি করিয়া থাকে, তাহা ত কাহারও অবিদিত নহে। ব্রিটিশ-সরকার যদি অন্য সরকারের প্রভাবে ধৈর্য্যচ্যুত না হন, তাঁহার পক্ষেই বা বিচলিত হইবার যুক্তিযুক্ত কি কারণ আছে? এ অবস্থায় বিবাদ বাড়াইয়া ত কোনো লাভ নাই, বরং মাথা খেলাইয়া যদি কোনোরূপ নিষ্পত্তি করিতে পারা যায়, তাহাই শ্রেয়ঃ।

নিষ্পত্তিসূত্রে তিনি প্রথমে বাকড়া এষ্টেটের মধ্যে দেবীপুর সরকারের যে সকল সম্পত্তি আছে, উচিত মূল্যে কিনিবার প্রস্তাব পাঠাইলেন।

উত্তরে দেবীপুর সরকার জানাইলেন,—তাঁহারা বরাবরই সম্পত্তি ক্রয় করিতেই অভ্যস্ত; যদি কোনো সম্পত্তি বিক্রয় করিবার প্রস্তাব থাকে, সানন্দে তাহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

ভূপতি বাবুর পূর্ব্ববর্ত্তীরা এরূপ উত্তর পাইলে হয়ত তৎক্ষণাৎ লাঠালাঠি বাধাইয়া বসিতেন। কিন্তু ভূপতি বাবু অবস্থার তালে তালে মাথা খেলাইবার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ এক্ষেত্রে তাঁহারই গরজ। অতঃপর সংশোধিত প্রস্তাব পাঠাইলেন,—অন্য কোনো আয়কর তালুকের বিনিময়ে দেবীপুর সরকার তাঁহাদের বাকড়ার সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে পারেন।

দেবীপুর এষ্টেট হইতে ইহার জবাব আসিল,—যথারীতি প্রার্থনা জানাইলে দেবীপুর-সরকার উক্ত সম্পত্তি বিনাসর্ত্তে দান করিতেও পারেন।

অন্য সময় ইহাই উপলক্ষ্য করিয়া এক নূতন অনর্থ হয়ত নিবিড় হইয়া উঠিত। কিন্তু বিচক্ষণ ভূপতি বাবু কথাটা চাপিয়া গেলেন, কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না। এমন কি, সেরেস্তার সর্ব্বময় কর্ত্তা দেওয়ান দয়ারাম পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিবার অবকাশ পাইলেন না।

কিন্তু কথাটা চাপিয়া গেলেও ভূপতি বাবু বিশ্বাসী লোক

লাগাইলেন, দেবীপুরের মালিক কলিকাতার বাড়ীতে আসিবা-মাত্রই যেন তিনি খবর পান।

এই দেবীপুর এষ্টেট ও তাহার মালিকদের ইতিহাস এমনই রহস্যাচ্ছন্ন যে তাঁহাদিগকে লইয়া কত কিম্বদন্তীই রূপকথার মত প্রচারিত হইয়াছে। যদিও ইহারা পশ্চিম প্রবাসী এবং সিপাহী বিদ্রোহের সময় হইতে ব্রিটিশ-সরকারের সহায়তাসূত্রে ইহাদের ভাগ্যোদয় ঘটে, কিন্তু ইহাদের মাতৃভূমি বাঙ্গলা দেশ।

পশ্চিম প্রদেশের আচার ব্যবহারে ইহারা অভ্যস্ত হইলেও বাঙ্গালীর বৈশিষ্টগুলি হারাইতে পারেন নাই। তাই, পুত্র কন্যাদের বিবাহসূত্রে বাঙ্গলার দিকেই তাকাইতে হয়; গাঁই গোত্র মেল বাছিয়া পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন না করিলেই নয়। বাঙ্গলার বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশের সহিত ইহাদের শোণিত-সম্বন্ধ নিবিড় হইয়াই রহিয়াছে।

ভূপতি বাবু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, শুধু তাঁহাদের বংশের সহিত এ পর্য্যন্ত দেবীপুরের ঐতিহাসিক বংশের কোনো যোগসূত্র রচিত হয় নাই। স্বার্থগত মনো-মালিন্যই সম্ভবতঃ ইহাতে অন্তরায় হইয়াছিল। ভূপতিবাবু ভাবিয়া দেখিলেন, দেবীপুরের প্রাসাদ হইতে তাঁহাদের কোনো কুলকন্যাকে বধূর মর্য্যাদা দিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে

পারেন ; কিন্তু তাঁহার বংশের কোনো কন্যা দেবীপুরের প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহাতে তাঁহার কৌলিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু শেষের বিষয়টি লইয়া গবেষণার কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হইল না, যেহেতু ভূপতি বাবুর বংশে এমন কোনো কন্যার অস্তিত্ব নাই—যাহাকে লইয়া এই সমস্যা উঠিতে পারে। তাঁহার একমাত্র সন্তান মহীপতি, রূপবান তরুণ যুবা, এই এষ্টেটের উত্তরাধিকারী। দেবীপুরের মালিক সম্পত্তি-সূত্রে তাঁহাকে প্রার্থী হইতে বলিয়াছেন। সম্পত্তির সহিত অন্য কোনো মূল্যবান প্রার্থনার বস্তুও ত থাকিতে পারে! তাহা কি তাঁহার পক্ষে দুর্লভ?

মনোমন্দিরে যখন এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় নিয়োজিত চর সংবাদ আনিল,—দেবীপুরের রাজা কলকেতার বাড়ীতে এসেছেন, মরশুমটা এখানেই কাটাবেন।

চর এই খবরের সহিত ইহাও হুজুরকে শুনাইয়া দিল,—রাজার সঙ্গে তাঁর এক নাতনীও এসেছেন, তিনিই এষ্টেটের উত্তরাধিকারিণী। এখনো তিনি অনূঢ়া, রাজকন্যা ত রাজ-কন্যাই! যেমন রূপ, তেমনি গুণ। রাজবাহাদুর নাতনীর জন্য সুপাত্র খুঁজছেন, ঘটক লাগিয়েছেন।

ভূপতি বাবুর দুই চক্ষু উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মনে মনে আওড়াইলেন,—যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী!

অজানা অতিথি

কাহাকেও কোনো কথা না বলিয়া এবং সঙ্গে কোনো পারিষদ বা বরকন্দাজ না লইয়া সেইদিনই ভূপতি বাবু কলিকাতায় রওনা হইলেন।

সার্কুলার রোডের উপর বাকড়ার বাবুদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা; রাজোচিত আদব কায়দা বজায় রাখিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাদের কোনটির অপ্রতুল এখানে ছিল না। এখানকার সেরেস্তার আমলারা তাহাদের হুজুরের আকস্মিক আবির্ভাবে সচকিত হইয়া উঠিল, আর কখনো তাহারা এভাবে হুজুরকে একাকী আসতে দেখে নাই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ত্রস্তভাবে ছুটিয়া আসিল, দুই চক্ষুতে প্রশ্ন ভরিয়া হুজুরের দিকে চাহিল।

হুজুর বিনা ভূমিকায় গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—লাটসাহেবের দরবারে যেতে যে পোষাক, গাড়ী, আসবাব, বরকন্দাজ সব দরকার হয়, এক ঘণ্টার মধ্যে তৈরী চাই।

হুকুম করিয়াই হুজুর খাস কামরায় ঢুকিলেন। সেরেস্তাশুদ্ধ সকলেই বুঝিল, লাটসাহেবের বাড়ী থেকে হুজুরের নেমন্তন্ন এসেছে, তাই এমন তাড়া।

সেরেস্তার কর্তা হুজুরের হুকুম তামিল করিতে খিদমতদারদের লইয়া পড়িল। কোথায় হুজুরের দরবারী পোষাক, কোথায় আছে আসা-সোঁটা, কে কে সঙ্গে যাইবে তকমা

চাপকান পরিয়া, বাহির কর ল্যাণ্ডো-ঘুড়ি, অতিকায় দুই ওয়েলার অশ্বের সাজ-সরঞ্জাম, তাহাদের সহিস্ কোচোয়ান—

দীর্ঘকাল ধরিয়া যাহাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনের কোনো সাড়া পড়ে নাই, আজ তাহাদিগকে কাজে লাগাইতে কর্ম্মকর্ত্তাদের কি তাড়া!

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হইয়া গেল। বাকড়া এষ্টেটের মনোগ্রাম-খচিত সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো, তাহার সৌষ্ঠব আরো বাড়াইয়া দিয়াছে। দামী চামড়ার সাজের উপর রূপার-সজ্জা চড়াইয়া দুই তেজস্বী ওয়েলার বাহক। গাড়ীর পিছনে রূপার আসা-সোঁটা ধরিয়া দুইজন তকমাধারী বরকন্দাজ, তাহাদের মখমলের চাপকানের উপর জরির কাজের বাহার, মাথায় পোষাকের অনুরূপ পাগড়ী। কোচোয়ানের পোষাকেও বৈচিত্র্যের অভাব নাই। তাহার পাশেই সিপাহীর সজ্জায় এক আরদালী; খাকীর পোষাক, মাথায় ফৌজী টুপী, কোমরে চামড়ার খাপে আঁটা তলোয়ার।

অতঃপর হুজুর যে পরিচ্ছদ পরিয়া সমবেত আমলাবর্গের কুর্ণিশ লইতে লইতে রাজকীয় যানে উঠিলেন, দিল্লীর দরবারে ভারতবর্ষের কোনো রুলিং চীফের সাজসজ্জায় এরূপ বৈচিত্র্য ও আড়ম্বর-প্রাচুর্য্য ছিল কিনা সন্দেহ।

দুই

সিপাহী বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দেবীপুরের রাজাদের ভাগ্যোদয় ঘটিয়াছিল। দেবীপদ রায় চৌধুরী ব্যবসায়-সূত্রে সে সময় যুক্তপ্রদেশের মৃজাপুর জিলায় সপরিবার বাসা পাতিয়াছিলেন। চানার ব্যবসায়ে তিনি ফাঁপিয়া উঠেন। তাঁহার ভাণ্ডারে সঞ্চিত সুপ্রচুর চানা এবং আনুষঙ্গিক সহায়তায় ব্রিটীশ সরকার বিশেষ ভাবে উপকৃত হন। এক অর্থশালী স্থানীয় ভুঁইয়া এই বিদ্রোহে সিপাহী-পক্ষ অবলম্বন করিয়া সবংশ উৎখাত হইলে দেবীপদ তাঁহার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি অতি সুবিধায় বন্দোবস্ত করিয়া লন। এ অঞ্চলে এরূপ জনপ্রবাদ যে, নূতন পরিকল্পনায় নগর পত্তন করিবার সময় দেবীপদ ভূতপূর্ব্ব ভুঁইয়ার ভিটার ভিতর বিপুল ধনসম্পত্তির সন্ধান পান। সেই অর্থেই ভাগিরথীর উপকূলে বহু দূর বিস্তৃত দুর্গাকৃতি বিশাল আবাস-ভবন ও এক নূতন নগর গড়িয়া উঠে। দেবীপদ নিজের নামানুসারে দেবীপুর নামে তাহাকে সুপরিচিত করেন। ইহাই দেবীপুর এষ্টেটের মূলতত্ত্ব।

এই এষ্টেটটী পুরুষানুক্রমে প্রতিষ্ঠার পথেই চলিয়া আসিয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দেবীপুর সরকারের প্রচুর ভূসম্পত্তি এবং সেই সূত্রে প্রত্যেক বড় বড় সহরে নিজস্ব

আবাস-ভবন, তহশীল-সেরেস্তা ও কোনো না কোনো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আছেই। সরকারদত্ত রাজোপাধি ইহাদের বংশগত। জ্যেষ্ঠসন্তান পুত্র বা কন্যা এই বংশের রীতি অনুসারে রাজকীয় গদী ও উপাধির উত্তরাধিকারী। বংশের অন্যান্য সন্তানগণ রাজকুমার বা রাজকন্যা উপাধির সহিত বৃত্তি ও বাসভবন লইয়াই তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়। এই এষ্টেটের সম্পত্তি বিভক্ত হইবার বিধি নাই, ব্যবস্থাও নাই। ইতিপূর্ব্বে কোনো কোনা বংশধর এ বিষয়ে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই।

বর্ত্তমানে এই এষ্টেট্ এক জটিল-সমস্যার সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছে। যাঁহার কর্ত্তৃত্বে ইহা পরিচালিত হইতেছে, তিনি এক রহস্যময়-পুরুষ। যদিও তিনি ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ অসংখ্য ঘটনার ভিতর দিয়া বার্দ্ধক্যের সীমাপ্রান্তে আসিয়া পহুঁছাইয়াছেন, কিন্তু অতি অন্তরঙ্গরাও এ পর্য্যন্ত তাঁহার রহস্যাচ্ছন্ন অন্তরটির দ্বার উদ্ঘাটন করিতে পরিয়াছেন, জোর করিয়া এ কথা বলিতে পারেন না। অদ্ভুত এই বর্ষীয়ান পুরুষটির প্রকৃতি। মুখে সদাসর্ব্বদাই প্রসন্ন হাসিটুকু লাগিয়াই আছে; ক্রোধ যে ক্ষেত্রে মাত্রা অতিক্রম করিয়া মানুষের মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া দিয়া থাকে, সেরূপ অবস্থাতেও এই অতিমানুষটির মুখের হাসি মুখেই লাগিয়া থাকে অতি বড় মনস্তত্ত্ববিদের পক্ষেই এ রহস্য নির্ণয় করা সম্ভবপর।

অজানা অতিথি

কাহারো সহিত কথোপকথন কালে কি সরলতাই ইহার আচরণে অতি স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায়, মুখ ও চক্ষুতে ব্যগ্র অনুসন্ধিৎসার কত নিদর্শনই ফুটিয়া উঠে। তাঁহার তৎকালীন ভাব ও ভঙ্গী যেন অকপটেই ব্যক্ত করে, আলোচ্য বিষয়ে অতি অজ্ঞ তিনি, বক্তার কথা যেন তাঁহাকে নূতন পন্থার নির্দ্দেশ দিতেছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, যাহারাই এই অল্পভাষী বৃদ্ধটিকে অজ্ঞ ও মূর্খ সাব্যস্ত করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই পরিণামে পস্তাইতে হইয়াছে। যে বুদ্ধিমান এই হাস্যমুখ মানুষটিকে অতিশয় সরল বা নিতান্ত নির্ব্বোধ স্থির করিয়া কাজ গুছাইয়াছেন ভাবিয়া আনন্দে ঢাক পিটাইয়াছেন, তাঁহাকেই অবশেষে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, তিনি এই দুর্ব্বোধ্য বৃদ্ধটিকে চিনিতে পারেন নাই, তাঁহার মুখের কথা ঠোঁটের হাসিটির মত মিষ্ট হইলেও তাহার যে অর্থ অন্যরূপ, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি সকলের ঘটে থাকে না।

কিন্তু একজনের ঘটে এই বুদ্ধিটুকু কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল, বুঝি রক্তের টানে ও নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য্যে। সেই এক জনকে লইয়াই এই রহস্যময় পুরুষটির সংসার। এক মাত্র এই মেয়েটিই বৃদ্ধের ঠোঁটের হাসির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে। তাঁর দৃষ্টি দেখিয়া বলিয়া দেয়; কি কি তিনি

চান। বৃদ্ধের মুখের সোজা কথার অর্থ যে কত দূর বাঁকা হইতে পারে, এই মেয়েটিই তাহা বুঝাইয়া দিবার শক্তি রাখে। কথায়-কথায় সেইই বৃদ্ধকে শুনাইয়া দেয়,—লোকের কাছে তুমি যতই বোকা সেজে থাকনা কেন, আমিই শুধু ধরে ফেলেছি, কত বড় সেয়না তুমি, দাদু!

বৃদ্ধ হাসিয়া উত্তর দিতেন,—তাহলে সেয়না আমাকে কি করে বলছিস দিদি, যখন ধরাই পড়ে গেছি!

এই বৃদ্ধই আমাদের উপন্যাসের মেরুদণ্ড। নাম, শক্তিপদ। দেবীপুর এষ্টেটের ইনিই এক্ষণে একেশ্বর মালিক। আর তরুণীটি ইহারই পৌত্রী; নাম কল্যাণী।

এক যুগের উপর হইল কল্যাণী পিতৃহারা হয়। তখন সে ছয় বৎসরের বালিকা। স্বপ্নের মত সে দিনের শোচনীয় স্মৃতি এখনও তাহার স্নায়ুমণ্ডলে শিহরণ তুলে। তাহার পিতা দুর্গাপদ তাতার অরণ্যে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। সায়াহ্নে অনুচরগণ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসে। নিজের বন্দুকের গুলীতে নিজেই আহত হইয়া তিনি পাহাড়ের চূড়া হইতে পড়িয়া যান। ইহাই অপমৃত্যুর কারণ। যে সময় এই দুঃসংবাদ আসে, কল্যাণীর মা উমারাণী তখন প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বামীর মৃতদেহ দেখিবার জন্য আর্ত্ত-আহ্বান তাঁহার কানে বাজিতেই স্বাধ্বী সুউচ্চ প্রাসাদ

-শিখর হইতে প্রাঙ্গণে স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বেই লাফাইয়া পড়েন। আর তাঁহার সংজ্ঞা হয় নাই। এক চিতায় পতি-পত্নীর দেহের অন্ত্যেষ্টি হইয়া যায়। সেই চিতা-ভস্ম লইতে নাগরিকাদের সে সময় কি উৎসাহ!

সেইদিন হইতে কল্যাণী দাদুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তাঁহারই স্নেহ-পুটে আশ্রয় পাইয়াছে। এ বংশের পুত্র হইবার সৌভাগ্য যে পাইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, যে সকল অভিজ্ঞতা শিক্ষাপটুতার ভিতর দিয়া তাহাকে আয়ত্ত করিতে হয়, বৃদ্ধের ব্যবস্থায় কল্যাণী সে সমস্তই অর্জ্জন করিয়াছে।

কল্যাণীই যে দেবীপুর এষ্টেটের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী, এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও, চক্রান্তের অভাব ছিল না। বৃত্তিভোগী বংশধরগণ একে একে মাথা তুলিয়া যেমনই চক্রান্তের জাল বুনিতে উদ্যত হইয়াছেন, অমনই বৃদ্ধ শক্তিপদ হাসিতে হাসিতে একটির পর একটি ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। এমন যে হইবে, দুর্ঘটনার দিনটি হইতেই তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই বংশের এই স্মৃতিচিহ্নটিকে সকল দিক দিয়া শক্তিসম্পন্ন করিতে তিনি শিক্ষার যে আয়োজন করিয়াছিলেন, কোনো স্বাধীন রাজ্যের রাজপুত্রের সম্বন্ধেও সেরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে কি না সন্দেহ। তাঁহার এই অপূর্ব্ব শিক্ষা-নৈপুণ্যের পরিচয় আমরা এই উপন্যাসেই যথাসময় পাইব।

তিন

ভুপতি বাবু যে দিন বাকড়ায় ফিরিলেন, সেইদিনই অপরাহ্ণে তাঁহার কাছারী বাড়ীর সুবৃহৎ দপ্তরখানায় সমবেত আমলা ও পারিষদবর্গের সমক্ষে সহর্ষে ঘোষণা করিলেন,—“শুনছ হে, দেবীপুরের রাজকন্যা এই বংশের বধূ হয়ে আসছেন।”

এই শুভ সংবাদে হুজুরের সমক্ষে আমলা ও পারিষদবর্গের যেরূপ ভাবভঙ্গি ও উল্লাস প্রকাশ আবশ্যক, তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইল না।

দেওয়ান হুজুরের সমীপবর্ত্তী হইয়া সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলে,—কথাবার্ত্তা তা হলে পাকা হয়ে গেছে হুজুর?

হুজুর কহিলেন,—হাঁ, একরকম পাকাই বৈ-কি। আমি রাজা বাহাদুরের কলকাতার প্রাসাদেই মেয়ে দেখে এসেছি। খাসা মেয়ে, তবে বয়স কিছু বেশী হয়ে গেছে এই যা—”

জনৈক পারিষদ অমনি বলিয়া উঠিল,—ওতে কিছু কিন্তু করবেন না হুজুর। আজকাল গরীবদের ঘরেই যখন বয়স বেশী ক’রে বিয়ে দেওয়া প্রথা হয়ে পা[illegible]ছে,—তখন রাজা-রাজড়ার ঘরে এযে হবে তাতে আর কথ[illegible]!”

হাসিয়া ভুপতি বাবু কহিলেন,—তা’ত বটেই! বিশেষতঃ আজকাল বড়লোকদের ঘরেও মেয়েদের রীতিমত লেখা পড়া

শিখিয়ে বিয়ে দেবার রীতি আরম্ভ হয়েছে। কাযেই মেয়েরা একটু বড়-সড়ই হয়। আমার ভাবী বউমাটিও খুব শিক্ষিতা। রাজা বাহাদুরের একান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে কুটুম্বিতা করা।

আর একজন পারিষদ বলিয়া উঠিল,—এটা হুজুর উভয় পক্ষেরই সৌভাগ্যের কথা। এমন সম্ভ্রান্ত নৈকষ্য কুলীন বংশ কোথায় দেখা যায়? বিশ ক্রোশের মধ্যে হুজুরের মত প্রবল প্রতাপ কুলে-শীলে ধনে-ঐশ্বর্য্যে আর কে আছে? হাঁ, তবে রাজা বাহাদুরের কথা সে আলদা! অত বড় ধনী জমিদার কি আর বাঙ্গালীর ভেতর আছে? দেশ-দেশান্তরের মুখ্যি কুলীন ওঁদের দুয়ারে বাঁধা হয়ে আছে! আর ঐশ্বর্য্য? বাঙ্গলায় এমন জেলা নেই, যেখানে ওঁদের জমিদারী না আছে।

ভূপতি বাবু বলিলেন,—শুধু বাঙ্গালা কেন, সারা ভারত-বর্ষেই ওঁদের জমীদারী; শুনেছি, কাশীতেও বড় অল্প সম্পত্তি নেই। আর এখানে? যদিও আমি জমীদার, কিন্তু এখানেও দেবীপুর রাজের সম্পত্তি কি বড় সামান্য?

দেওয়ান বলিলেন,—সামান্য! গঙ্গার ধারে একশ বিঘে জমির ওপর রাজপ্রাসাদ। ইউল কোম্পানীর জুট মিল চলেছে দেবীপুরের রাজার জমির ওপর, বরণ কোম্পানীর ইটখোলা, সুতোর কল,—সবই দেবীপুরের রাজার জমিতে। অবশ্য এদের

আশে-পাশে হুজুরেরও জমি যথেষ্ট, কিন্তু বিদেশে দেবীপুরের রাজারা যে রকম সম্পত্তি করেছেন, এমনটী খুব কমই দেখ' যায়।

ভূপতি বাবু বলিলেন,—তাতে আর কথা কি? মিত্তিরজা যে বললে, দেবীপুরের দোরে যত সব কুলীন বাঁধা হয়ে আছে, সেটা মিথ্যে কথা; সে সব কাল চলে গেছে। তখন এই দেবীপুরের রাজারা এক একটা কুলীন পাত্রের জন্য দু পাঁচ লাখ বার করতে দ্বিধা করতেন না, কিন্তু এখনকার রাজা পয়সাটা বিলক্ষণ চিনে নিয়েছেন। রাজবাড়ীতে কুলীন হাতী বাঁধবার সখটুকু এঁর মোটেই নেই, তার স্থলে বড় বড় জমিদারী হাতী বেঁধে রেখে তাঁদের মাথা কিনে নিয়েছেন। হুঁসিয়ার হিসেবী লোক হে, সে যুগের দাতাকর্ণ নয়।

দেওয়ানজী বলিলেন,—এখনকার রাজার সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনতে পাই বটে, তাতে তাঁকে খুব বিচক্ষণ বলেই মনে হয়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখনও তাঁকে দর্শন [illegible]রার ভাগ্য আমাদের হয়ে ওঠেনি।

ভূপতি বাবু বলিলেন,—এইবা[illegible]ব হে, এইবার হবে দেওয়ান। আর তিনিও তাঁর বাকড়ার বাড়ীতে এ পর্য্যন্ত কখনও আসেননি! এই প্রথম আসছেন—আসছে শ্রীপঞ্চমীর দিন।

সমস্বরে সহর্ষে সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—বটে! বটে!

ভূপতি বাবু বলিলেন,—ঐদিনই তিনি পাত্র দেখে আশীর্বাদ করবেন। এই সুসংবাদে সকলের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

মিত্তিরজা বলিলেন,—বেশ, বেশ, তা'হলে এই ফাল্গুনেই শুভকার্য্য সম্পন্ন হচ্ছে।

ভূপতি বাবু বলিলেন,—ইচ্ছা ত এইরূপ, তবে সমস্তই ভবিতব্যের হাত। আর এ শুভ সংযোগের অর্থ কি জান? রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে দেবীপুর রাজ্যের সমস্ত সম্পত্তিই এই এষ্টেটের সঙ্গে মিশে যাওয়া। কারণ, রাজার এই পৌত্রীই তাবৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। তাঁর আর অন্য সন্তান নাই, নিজে বিপত্নীক।

আবার সভাসদগণের বদন হর্ষোজ্জ্বল হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা বুঝিতে সক্ষম হইলেন যে, তাঁহাদের ধনগর্ব্বিত হুজুর, এতক্ষণ দেবীপুর রাজ্যের ধনসম্পত্তি সম্বন্ধে শতমুখ হইয়াছিলেন কেন!

সেইদিনই গ্রাম মধ্যে জমিদার ভূপতি বাবু ও তৎপুত্র শ্রীমান মহীপতি মুখোপাধ্যায়ের ভাবী সৌভাগ্যের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

সকলেই একবাক্যে বলিল,—"ভাগ্যেই ভাগ্যের সংযোগ হয়, জলেই জল বাঁধে।"

চার

কিন্তু ভূপতি বাবু কায়মন প্রাণে যে স্মরণীয় দিনটির প্রতীক্ষ করিতেছিলেন, সে দিনটি উপস্থিত হইবার একপক্ষ পূর্ব্বেই তাঁহার জীবনের শেষ দিন সহসা এমন অতর্কিত ভাবে আসিয় উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে সমস্ত আশা, আকাঙ্খা ও বাসনা ত্যাগ করিয়া অজ্ঞাত পথে পাড়ী দিতে হইল।

তারযোগে দেবীপুরের রাজাকে এই শোক সংবাদ জানানো হইল। উত্তরে রাজা বাহাদুর তারযোগে সমবেদনা জ্ঞাপন করিলেন। মহাসমারোহে স্বর্গগত জমিদারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল। রাজা বাহাদুর নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন—কিন্তু ঠিক সেই সময় তিনি বিশেষ প্রয়োজনে স্থানান্তরে যাইতেছেন—এই অজুহতে তাঁহার কোনো বিশিষ্ট প্রতিনিধি শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিয়া যথাকর্ত্তব্য পালন করিলেন। ভূপতি বাবু বিচক্ষণ জমিদার ছিলেন। জমিদারীর জমিমাত্রই তাঁহার কা[illegible] কল্পতরু বা কামধেনু তুল্য ছিল। জমির গায়ে হাত বুলাইলেই যে তাহার মধ্য হইতে কাম্য নিঃসৃত হয়, তাহা তিনি যেমন বুঝিয়াছিলেন, হাত বুলাইবার মোহময় প্রণালীর সহিত, তেমন তিনি উত্তমরূপে পরিচিতও ছিলেন, কাযেই তাঁহার অভিজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহারের

গুণে জমির উপস্বত্ব নানা প্রকারে প্রজাদের বক্ষাঞ্জলীর মধ্য দিয়া সুশৃঙ্খলে তাঁহার ভাণ্ডারে প্রবেশ করিত। তিনি যেমন নানা উপায়ে লইতে জানিতেন, তেমনি সকরের সহিতও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার মনে মনে আভিজাত্যের অহঙ্কার পূর্ণ মাত্রায় থাকিলেও, তিনি আবশ্যক স্থলে সময় সময় পাত্রবিশেষে এরূপ উদারতার ভাব প্রকাশ করিতেন যে, তাঁহার স্তাবকদল মুগ্ধভাবে তাঁহার গুণ গান করিত।

আবার এই হুজুরেরই স্থাপিত গ্রাম্য বিদ্যালয়ে হুজুরের পুত্রের জন্য স্বতন্ত্র আসনের ব্যবস্থা থাকিত বলিয়া দীননাথ চট্টোপাধ্যায় নামে একটি তেজস্বী ছাত্র যখন প্রতিবাদ করে এবং এই প্রতিবাদের কথা শুনিয়া হুজুর সক্রোধে তাহার শাস্তির ব্যবস্থায় অবহিত হইলে, এই স্তাবকের দলই তাহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছিল,—"হুজুরের রাগ ত হবারই কথা, বড় লোকের ছেলের বড়মানুষী দেখে গরীবের ছেলের চোখ টাটানই দোষ!

এ হেন বিচক্ষণ হুজুরের পুত্র শ্রীমান মহীপতি মুখোপাধ্যায় যখন জমিদারী তক্তে আসীন হইলেন, তখন তাঁহার গাম্ভীর্য্যময় ভাব-ভঙ্গী, আভিজাত্যের অহঙ্কার, ধনগৌরবের স্পর্দ্ধা, তাঁহাকে এভাবে পাইয়া বসিল যে, অল্পদিনের মধ্যেই

বর্ত্তমান প্রগতির যুগে তাঁহার পক্ষে সেগুলি দুর্গতির মতই সমস্যার সৃষ্টি করিল।

স্বর্গীয় জমিদার কাছারী বাড়ীতেই মজলিস করিয়া বসিতেন। মজলিস স্থলেই তিনি প্রজাগণের অভাব অভিযোগ শুনিতেন এবং যাহাতে নিজের স্বার্থের কিছুমাত্র অপচয় না হয়, বরং আমদানী সূত্রে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের সম্ভাবনা থাকে, সেদিকে চাহিয়া এমন ভাবে কায সারিতেন যে, সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে। সুবিচারও তিনি করিতেন। কিন্তু নবীন জমিদার পিতার এই উদারতা, জনসাধারণের সমক্ষে কারণ অকারণে সুলভদর্শনদানরূপ দুর্ব্বলতা তাঁহার মত জমিদারের পক্ষে নিতান্ত অসমীচীন মনে করিয়া প্রহরী-রক্ষিত স্বতন্ত্র সুসজ্জিত সুবৃহৎ কক্ষে জমিদারের খাসকামরা বহাল করিলেন। আভিজাত্যের স্পর্দ্ধার দিকে এই নবীন জমিদারটির প্রকৃতি নিত্য এভাবে অগ্রসর হইতেছিল যে, সাধারণের সংস্পর্শে আসা বা সাধারণ কোনও ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎকারকেও তিনি নিতান্ত সম্ভ্রমহানিকর ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন।

প্রবীণ সমাজ নানা কারণে সবই সহিয়া যাইতেন; কিন্তু তরুণদল গর্জ্জন করিয়া প্রতিবাদ করিল,—সিরাজদ্দৌলার যুগ এখন নেই, আমরা গরীব হলেও মানুষ।

দেওয়ান একদিন জমিদার বাবুর খাস-কামরায় গিয়া

সসম্ভ্রমে বলিলেন,—নানাজনে নানারকম নিন্দা করছে আমার বিবেচনায় সাধারণকে বর্জ্জন না ক'রে তাদের সঙ্গে মেলামেশা—"

দেওয়ানজীকে আর বলিতে হইলনা, বারুদের স্তূপে যেন জলন্ত অগ্নি গোলক আসিয়া পড়িল। গর্জ্জন করিয়া মহীপতি বলিয়া উঠিলেন,—"কি ভাবে মেলামেশা করতে হ'বে সাধারণ ছুঁচোদের সঙ্গে শুনি? ধেই ধেই ক'রে নৃত্য করতে হ'বে, না তাদের সঙ্গে কোমর বেঁধে চাকরী করতে ছুটতে হবে পরের আফিসে? নিন্দা করছে! নিন্দা করলে আমার তালুক নীলেমে উঠবে! যাও—যাও—নিজের কায কর গিয়ে।"

পিতৃবয়সী চিরহিতৈষী দেওয়ান পুত্রতুল্য স্নেহভাজন জমিদার পুত্রকে সম্যক চিনিয়াও কারণ অকারণে উপদেশ দিবার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিতেন না। লোক নিন্দার কথা স্তাবকবৃন্দের মুখে আজ পূর্ব্বাহ্ণেই মহীপতি শুনিয়াছিল; যে যত বড় অহঙ্কারী, নিন্দাবাদ তাহাকে তত বড় আঘাত দিয়া কাতর করিয়া তুলে! ক্রোধে ক্ষোভে মহীপতি স্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল, দেওয়ানের বার্ত্তা তাহাকে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত করিল। মনিবের নিকট এই আঘাত পাইয়া নিরুত্তরেই দেওয়ান কাছারীতে ফিরিয়া আসিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহীপতি দেওয়ানকে ডাকাইয়া সহসা

জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন কোন সাধারণ অনুষ্ঠানে আমাদের চাঁদা দিতে হয়, তার একটা ফর্দ্দ পেশ কর। আজই আমি চাই।"

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফর্দ্দ লইয়া দেওয়ানজী উপস্থিত হইলেন। মহীপতি দেখিল—বিদ্যালয়, পাঠশালা, অনাথালয়, হরিসভা, পাঠাগার, হাঁসপাতাল প্রভৃতি সাধারণ প্রতিষ্ঠান-গুলিতে নিয়মিতরূপ প্রতিমাসে এক একটা নির্দ্ধারিত চাঁদা দেওয়া হয়, ফর্দ্দে তাহার হিসাব রহিয়া[illegible]।

তখনই মহীপতি বাবুর হুকু[illegible]মা জারী হইল,—আগামী মাস হইতে কোনও সাধা[illegible] অনুষ্ঠানে আর মাসিক সাহায্য প্রদত্ত হইবে না। হুকু[illegible] লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে জমিদারের শীলমোহর [illegible]ত হইয়া গেল। বৃদ্ধ দেওয়ান কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ন[illegible] প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পাঁচ

সাধারণ অনুষ্ঠানে জমিদারের সাহায্য রহিত হইবার সংবাদে জনসাধারণ স্তম্ভিত হইল। প্রবীণগণ তরুণদের উদ্দেশে গরল উদ্গার করিতে লাগিলেন। তরুণগণ তাহার প্রতিবাদে দলবদ্ধ হইয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, এই সকল অনুষ্ঠানে জমিদার পক্ষ হইতে যে পরিমাণ সহায়তা আসিত, সেইমত আয়ের প্রতিশ্রুতি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল।

গ্রামের তরুণ সঙ্ঘের কর্ণধার ছিল দীননাথ চট্টোপাধ্যায়। এই উৎসাহী, উচ্চশিক্ষিত, সকল সদানুষ্ঠানে তৎপর, মেধাবী ছেলেটি গ্রামের ভূষণস্বরূপ, সকলেরই স্নেহ-শ্রদ্ধা অধিকার করিয়াছিল। ইহার উদ্যোগে অল্পদিনের মধ্যেই বিশিষ্ট সমাজের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। তরুণসঙ্ঘ মহোল্লাসে পাঠাগারের বার্ষিকোৎসবে মাতিল। তাহাদের বিপুল উৎসাহ দেখিয়া প্রবীণ সমাজকে মৌণ মুগ্ধ হইতে হইল।

মহীপতি বাবু মনে করিয়াছিল যে, সাধারণ অনুষ্ঠান সমূহে সহায়তা সম্বন্ধে জমিদার নির্দ্দয় হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার দয়া আকর্ষণের জন্য সাধারণ সমাজ তাঁহার দ্বারে ধন্না দিয়া পড়িবে, তখন তিনি রীতিমত এক হাত লইবেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, কেহই তাঁহার সিংহদ্বারে হত্যা দিলনা, সাধারণের

মধ্যে কোনও প্রকার চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলনা, বরং যখন সংবাদ পাইলেন যে, দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের চেষ্টায় জমিদারের আনুকূল্যের অনুরূপ অর্থ সাধারণের মধ্য হইতেই সংগ্রহের উপায় হইয়াছে, তখন রুদ্ধরোষে এই উদ্ধত যুবক যেন স্তব্ধ হইয়া গেল! এতদিন পরে দীননাথের দৃপ্ত মূর্ত্তী তাঁহার চক্ষুর উপর উজ্জ্বলরূপে ভাসিয়া উঠিল! গ্রাম্য বিদ্যালয়ে শিক্ষক সমক্ষে বারো বৎসরের বালকের কি তীব্র তেজস্বীতা,—'বিদ্যালয়ে সকল ছাত্রই সমান, বড় লোকের ছেলে বলে এত খাতির কিসের?'—শঙ্খনাদের মত সেই কথা আজ বুঝি মহীপতির কর্ণে ঝঙ্কার দিল।—সেই দীননাথ আজ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী! দন্তে অধর পেষণ করিয়া মহীপতি তীব্র ভ্রূকুটী করিল।

এই সময় দেওয়ান ধীরে ধীরে [illegible]পতির খাস কামরায় প্রবেশ করিলেন।

মহীপতি দেওয়ানের দিকে চ[illegible]া রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিশু পণ্ডিতের ছেলে [illegible] বওয়াটে দীনে চাটুয্যে আজকাল গ্রামের মোড়ল হয়ে বসেছে না?"

জমিদারী সেরেস্তায় কায করিয়া যাঁহারা মস্তকের কেশ পক্ক করিয়াছেন, জমিদারীর সহিত মালিক জমিদারের হৃদয়খানিও তাঁহাদিগকে সেরেস্তার চিঠার মতই পাঠ করিয়া

রাখিতে হয়। মহীপতি বাবুর প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে দেওয়ানজীর বিলম্ব হইলনা তিনি বলিলেন,—গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল, এই রকম কিছু হবে। বাকড়ার জমিদার-বংশই বরাবর এ অঞ্চলের পঁচিশখানা গ্রামের মাথা, সমাজপতি।"

মহীপতির গুরুগম্ভীর মুখখানি এই মুখরোচক উত্তরে ঈষৎ প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পুনরায় প্রশ্ন হইল,—সাহায্যগুলো বন্ধ করে দেওয়াতে এই সূত্রে দীনে একটা দল পাকাবার চেষ্টা করছে বোধ হয়?"

শুষ্ককণ্ঠে দেওয়ান কহিলেন,—"হাঁ, এই রকম শুনতে পাচ্ছি বটে।"

"হুঁ! ও এখন কি করে, জান?"

"ছাই করে! এম, এ, পাশ করে এসে কিনা ইউল কোম্পানীর কলে পাটের দালালী করছে।"

"স্মিত হাস্যে মহীপতি বলিল,—বল কি! দালালী?—আমি মনে করি বা বড় পায়া কিছু পেয়েছে। তা এতে উপায় কি হয়?"

দেওয়ান অবজ্ঞা ভরে বলিলেন,—পাটকলের কায, দুহাতে লুঠ, কাযেই উপায় মন্দ হয়না; কিন্তু হলে কি হবে, বাপের যে এক কাঁড়ি দেনা আছে; তাই শুধছে, আর লাইব্রেরীর গর্ভে গুঁজছে।"

অজানা অতিথি

"বিয়ে করেছে ?"

"রাধামাধব ! কে বে দেবে বলুন ! বাপ নেই, মা নেই, আপনার বলতে কেউ নেই, অথচ এক পাল পুষ্যি আছে ।"

"কি রকম ? পুষ্যি আবার কারা ?"

"দেওয়ান তাচ্ছিল্য-সহকারে বলিলেন,—যাদের তিনকুলে কেউ নেই, তারাই ওর পুষ্যি,—এই সব বেউণ্ডুলেদের নিয়ে ওর এক মস্ত সংসার ! তার ওপর গরীবের ঘোড়া রোগ, লাইব্রেরী, অনাথ-ভাণ্ডার, হরি সভা, এসব নিয়েই ত মজল' ।"

শ্লেষের হাসি হাসিয়া মহীপতি বাবু বলিয়া উঠল,—ওঃ দাতা কর্ণের অবতার বটে ! ভাল কথা ; শুনছিলেম, কয়েক সপ্তাহ ধরে রাজবাড়ীর সংস্কার চলেছে, খবর কিছু পেয়েছ ?"

দেওয়ান ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন,—আমিত এ সম্বন্ধেই কথা কয়বার জন্য হুজুরের কাছে এসেছি। হুজুর কি কোন পত্র পান নি ?"

আগ্রহের সহিত হুজুর জিজ্ঞাসা করল,—"কি পত্র ?"

দেওয়ান বলিলেন,—রাজা-বাহাদুর আমার পত্রের উত্তরে ওয়াল্টেয়ার থেকে লিখেছিলেন যে, চৈত্র মাসে তিনি এখানে এসে পাত্র দেখবেন ও শুভকার্য্যের সমস্ত স্থির করবেন। এ পত্রের কথা আমি জানি। এর পরে আর কোনও পত্র হুজুর পেয়েছেন কি ?

মহীপতি বাবু ঈষৎ ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন,—না,—আমি এ সম্বন্ধে আর কোন পত্র পাইনি।"

বিস্ময়ের স্বরে দেওয়ান বলিলেন,—অত ঘটা করে বাড়ী বাগান মেরামত হচ্ছে, রাজা বাহাদুর আসছেন বলে শোনাও যাচ্ছে, অথচ হুজুরের কাছে কোন খবরই এলনা!"

মহীপতিবাবু বলিলেন,—আসবার পূর্ব্বেই হয়ত তার করবেন।"

দেওয়ান বলিলেন,—"তাই সম্ভব।"

ছয়

পরদিনই দেওয়ান খবর আনিলেন, দেবীপুরের রাজ-বাড়ীতে রাজা বাহাদুরের পরিবর্ত্তে তাঁহার এক বর্ষীয়ান আমলা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। রাজকন্যা পুরীতে আসিয়া সহসা অসুস্থ হওয়ায়, রাজা বাহাদুরের এ যাত্রা বাকড়ায় আসা ঘটিলনা, জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষা-শেষি আসিবার সম্ভাবনা আছে।

এই সংবাদে মহীপতি বাবু যতটা হতাশ হইলেন, বিরক্ত হইলেন তদপেক্ষা অনেক বেশী। রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া রাজ-জামাতার গৌরব আয়ত্ত করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যস্ত হইয়াই পড়িয়াছিলেন।

দিন দুই তিন পরের কথা। সেদিন ছুটির বার। বেলা-বেলিই মহীপতি বাবুর মজলিস বসিয়াছে। মজলিসে আজ প্রধান আলোচ্য বিষয় লাইব্রেরীর বার্ষিক উৎসবের নিমন্ত্রণ-পত্র। মহীপতি বাবুর নামে আসিয়াছে। পত্রে লেখা আছে পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিকোৎসবে দেবীপুরের স্বনামখ্যাত রাজ-কবি সভাপতির আসন গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীননাথ চট্টোপাধ্যায় একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। ইত্যাদি।

মহীপতি বাবুর অন্তরঙ্গ পারিষদ ভজহরি বলিল,—আর

কেউ হলে ত কোন কথা ছিলনা, কিন্তু হুজুরেরই ভাবী শ্বশুরের যে অন্নদাস, তাঁরই বাড়ীতে এসে উঠেছে; সে কোন্ ভরসায় এই সভায় সভাপতি হতে চলেছে?"

দেওয়ানজীও এই সভায় আহুত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"উনি কি করে জানবেন বলুন যে হুজুরের ওপর টেক্কা দিয়ে এ সভা হচ্ছে?"

ভজহরি উত্তর দিল,—"তার জানা উচিত ছিল না?—হুজুরের কাছে তার আসাও একদিন নিশ্চয়ই উচিত ছিল।

মহীপতি বলিল,—দেবীপুরের এক আমলাই ত এখানে এসেছে এই রকম শুনেছিলাম। এখন সেই আমলা রাজকবি হয়ে গেল, ব্যাপার কি দেওয়ানজী?"

দেওয়ান বলিলেন,—উনি আগে আমলাই ছিলেন। এখন অবসর নিয়ে মধ্যে মধ্যে রাজাকে বইটা-আসটা পড়ে শোনান, কবিতা ছড়াটা বাঁধবার ক্ষমতাও আছে। রাজা ভালবেসে রাজকবি উপাধি দিয়েছেন। এই রকম শুনেছি।"

মহীপতি বলিল,—"লাইব্রেরীওয়ালারা এর পাত্তা পেলে কি করে?"

দেওয়ান উত্তর করিলেন,—"লোকটার পড়াশুনার ভারি বাতিক, লাইব্রেরীতে বইটা-আসটা খুঁজতে গিয়েছিল, তাইতে

সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে থাকবে। তবে বৃদ্ধটি খুব সদালাপী বলেই শুনেছি।

ভজহরি বলিল,—কিন্তু হুজুর, এ আমি বলে রাখছি, যে কোনও রকমেই হোক সভায় যোগ দিতে যদি ওকে না রোখেন, তখন কিন্তু পস্তাতে হবে। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে তখন হুজুরের মনে ধরবে।"

এই সময় সহসা পেস্কার শশব্যস্তে মজলিসে আসিয়া সংবাদ দিল,—দেবীপুরের রাজবাড়ী থেকে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক এসেছেন ; হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চান।

অমনই মজলিস ভবন আচম্বিতে স্তব্ধ হইল। সকলেই কৌতুহলভরে প্রভুর দিকে চাহিল। মহীপতি গম্ভীরভাবে বলিল,—আচ্ছা, আসতে বল।"

দেওয়ান বলিলেন,—আমি এগিয়ে গিয়ে আনব কি ?

উপেক্ষার স্বরে মহীপতি বলি[illegible]—কে এমন মাতব্বর আসছেন যে অত খাতির করে আ[illegible] হবে! চাকর চাকরের মতই আসবে, দেখা করবার [illegible]ন দিয়েছি এই তার পক্ষে যথেষ্ট। লাইব্রেরীওয়ালাদের কাছে সে রাজকবি হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে—"

সহসা স্বর রুদ্ধ হইল, মহীপতির অভিভূত দৃষ্টি দ্বারের দিকে নিবদ্ধ হইল। সকলেই সবিস্ময়ে দেখিল,—এক দীর্ঘ-

কেহ দীর্ঘশ্মশ্রু ঋষিতুল্য বর্ষীয়ান পুরুষ এক অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীর হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেছেন।

বৃদ্ধ আশীর্ব্বাদের উদ্দেশ্যে ডান হাতখানি তুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তরুণী দুই হাত যুক্ত করিয়া নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথায় ঠেকাইলেন। দেওয়ানজী সসম্ভ্রমে বলিলেন,—"আসুন, আসুন।"

বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—কদিন হ'ল এসেছি, কিন্তু হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর সুযোগ হ'য়ে ওঠে নি; আজ ভাবলুম, একবার পরিচয়টা করে আসি। নাতনীটীও ছাড়লে না, বললে, দাদু! হবুজামাই বাবুকে আমিও দেখে আসব। তাই সঙ্গে এনেছি। হুজুরের সব কুশল ত?

হুজুরের মনোরাজ্যে এতক্ষণ বিষম গোলযোগ বাধিয়াছিল; এই বৃদ্ধের উদ্দেশে সজ্জিত শাণিত অস্ত্রগুলি, বৃদ্ধের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে অথবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী লজ্জা সঙ্কোচশূন্যা তরুণীর অসাধারণ রূপলাবণ্যের ধাঁধায়, এতক্ষণ বুঝি তাহার আয়ত্তের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধের কথায় তাহার আভিজাত্যের স্পন্দন ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিল। সে এবার চিন্তার থেই হারাইয়া সহসা বলিয়া উঠিল,—রাজা বাহাদুরের খবর কি? তিনি এখন কোথায়?"

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ স্মিত বদনে বলিলেন,—পুরীতেই এখন তাঁরা

আছেন। রাজকন্যা অপেক্ষাকৃত ভালই আছেন। শীঘ্রই এখানে আসবেন।"

মহীপতির মনে এখন এই সমস্যা প্রবলভাবে গোল তুলিয়াছে বৃদ্ধকে কি ভাবে সম্বোধন করিবে! আপনি বলিয়া তাহাকে মর্যাদা দিবে, কিম্বা তুমি বলিবে? বৃদ্ধের গাম্ভীর্যময় ব্যক্তিত্ব এবং সুন্দরী তরুণীর পিতৃত্ব তাঁহাকে সম্মান দিতেই চাহিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণে আভিজাত্যের দিক দিয়া এই আমলা স্থানীয় নগণ্য মানুষটিকে সম্মানজনক ভাষায় সম্বোধন করিতেও তাঁহার দ্বিধা হইতেছিল।

সহসা তরুণী বলিয়া উঠিল,—দাদু, দেখা ত হ'ল কথাও হ'ল; চল আমরা বাড়ী যাই। আর কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকব?

দেওয়ান এবার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রভুর হুকুম না হইলে অভ্যাগতকে প্রভুর সমক্ষে বসিতে বলিবার অধিকার তাঁহার ছিলনা। তিনি হুজুরের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি অতি দীনভাবে পাতিলেন।

হুজুরের সম্মুখে আশে পাশে অনেকগুলি সোফা খালি ছিল। একখানি সোফার দিকে অঙ্গুলি হেলন করিয়া তরুণীর দিকে চাহিয়া সে বলিল,—আপনি বসুন না।

তরুণী শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল,—এটা হুজুরের কোন

দেখী ভব্যতা! দাদু দাঁড়িয়ে রইলেন, আর আমাকে বসতে বললেন! আমার প্রতি হুজুরের এটুকু অনুগ্রহের কারণটা কি শুনি?

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মহীপতি উত্তর দিল,—কারণ এই—আপনি ভদ্রমহিলা, আপনার সম্মান আগে।

দৃপ্তস্বরে তরুণী বলিল,—অভ্যাগতের সম্মান তারও আগে। হিন্দুধর্ম্ম এই বলে যে, অভ্যাগত বাড়ীতে এলে তখনই তাকে বসতে আসন দিতে হয়, নতুবা গৃহস্বামীর পিতৃপুরুষ এসে মাথা পেতে দেন। হুজুর হয়ত এসব মানেন না?

তরকারি অতি সুপাচ্য ও উপাদেয় হইলে, তীব্র ঝালের জন্য যেমন তাহা পরিত্যক্ত হয় না,—লালা-নিঃস্রাবিত-মুখেও ভোক্তা তাহার মাধুর্য্য উপভোগ করিতে থাকে, এই তিক্তভাষিণী সুন্দরী তরুণীর মুখের তীব্র বাণীও বোধ হয়, আজ মহীপতি বাবুর নিকট তেমনই উপভোগ্য হইল। সে তখন হস্ত প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধকে সম্ভাষণ করিল,—বসুন নায়েব মশাই, কিছু মনে করবেন না।

বৃদ্ধ হাসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তরুণীও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া হাসিয়া বলিল,—এ যেন আমাদের জোর করে আসন আদায় করে নেওয়া হল।

বৃদ্ধ বলিলেন,—আমার নাতিনীটি কিছু প্রগলভা, দেবীপুরের

রাজকন্যার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা থেকে এমনই হয়েছে। হুজুর অবশ্য কিছু মনে করবেন না!

মহীপতি বলিল,—ইনি বুঝি খুব লেখাপড়া শিখেছেন?

বৃদ্ধ বলিলেন,—লেখা পড়া রীতিমত শিখেছেন রাজকন্যা। তবে দিদি আমার সদা সর্ব্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতেন কিনা, কিছু কিছু তাঁর কাছ থেকে সঞ্চয় করেছেন।

ভজহরি এই সময় গলাটা একটু ঝাড়িয়া বলিল,—আপনি লাইব্রেরীওলাদের সভায় সভাপতি হয়েছেন না?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—পাকে চক্রে হতে হয়েছে বটে। আমার অপরাধ, আমি এখানে এসে লাইব্রেরী থেকে খান কতক বিলাতী কেতাব পড়বার জন্যে আনাই। তাইতেই এঁরা আমার বিদ্যে ধ'রে ফেলে একেবারে সভাদিগ্‌গজ করে তুলেছেন আর কি!

ভজহরি বলিল,—আপনি বোধ হয় জানেন না, আমাদের হুজুরের ঐ বওয়াটে দলের সঙ্গে কোনও সংস্রব নেই,—এমন কি, হুজুর চাঁদা দেওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন!

বৃদ্ধ বলিলেন,—বটে! কিন্তু লাইব্রেরীর ব্যবস্থা আর উদ্যোক্তাদের উদ্যম দেখে লাইব্রেরীর ওপর আমার বেশ শ্রদ্ধাই হয়েছিল, বিশেষ যখন দেবীপুরের রাজাই এই লাইব্রেরীর বিল্ডিংটি তৈরী করিয়ে দিয়েছেন।

ভজহরি এবার উষ্ণ হইয়া বলিল,—তাইতেই ত এখানে ছুঁচোর কেত্তোন আরম্ভ হয়েছে মশাই! দেবীপুরের রাজার টাকার লাইব্রেরী তৈরী হয়েছে বললেন না, কিন্তু এখন লাইব্রেরীর পাওয়ার রাজার ভাবী জামাইকে গ্রামের মধ্যে আনতে চায় না!

মহীপতি বলিল,—আমার মনে হয়, আপনি এর মধ্যে না গেলেই ভাল হয়।

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একবার পার্শ্ববর্তিনী তরুণীটির দিকে চাহিলেন মাত্র। সে অসঙ্কোচে মহীপতি বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল,—কেন, বলুন ত?

বোধ হয় তাহার কণ্ঠস্বরে জ্বালা ছিল।

মহীপতি স্তব্ধ হইল। এ পর্য্যন্ত তাহার মুখের উপর কেহ এরূপ দৃপ্তস্বরে প্রশ্ন তুলিতে সাহস পায় নাই। কিন্তু আজ তাহার মস্তিষ্কে বিষম গোলযোগ বাধিয়াছিল, অভিজাত্যের দৃঢ়তা পদে পদে শিথিল হইতেছিল। সে এবার তরুণীর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কথাটার এই ভাবে উত্তর দিল,—সাধারণের সংস্রবে যাওয়া আমি পছন্দ করি না।

তরুণী হাসিয়া বলিল,—কিন্তু হুজুর ত জানেন, আমরাও সাধারণের সামিল। আমার দাদু দেবীপুর রাজের সামান্য এক নায়েব মশাই, হুজুরও তা জেনেছেন। কিন্তু সাধারণে তাঁকে

রাজকবি ব'লে বরণ করে নিয়েছে, তিনি তাদের কি করে ত্যাগ করবেন বলুন ?

মহীপতি বলিল,—বেশ, তা হলে ওদের নিয়েই থাকুন। আমার এখানে আসবার ত কোন প্রয়োজন ছিল না, আর আমি আসবার জন্ম আমন্ত্রণও করিনি।

বৃদ্ধ বলিলেন,—না, না, সেকি কথা, হুজুর! আপনি রুষ্ট হলে আমাদের মঙ্গল নেই। তবে কি করি বলুন, কথাটা দিয়ে ফেলেছি। আর এ সব অতি তুচ্ছ বিষয়, হুজুরের উপেক্ষা করাই উচিত।

এই সময় সদর-নায়েব আসিয়া হুজুরকে রীতিমত অভিবাদন করিয়া বলিল,—হুজুর, মফস্বলের একজন মাতব্বর প্রজা এসেছে, বিশেষ প্রয়োজনে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এইবার হুজুরের অভিজাত্যের দ্যুতি অকস্মাৎ বিস্ফুরিত হইয়া উঠিল। বলিল,—মাতব্বর প্রজাটি কত টাকার জমা রাখে ?

সদর নায়েব সবিনয়ে উত্তর দিল,—আজ্ঞে প্রায় পঞ্চাশ টাকা।

তাচ্ছিল্য সহকারে হুজুর বলিল,—পঞ্চাশ টাকার মাতব্বর প্রজা বাকড়ার জমিদারের সামনে এসে দাঁড়াতে চায়! স্পর্দ্ধা ত কম নয়!

সদর নায়েব গাঢ় স্বরে বলিল,—হুজুর তার বিশেষ দরকার।

হুঙ্কার দিয়া হুজুর বলিল,—দরখাস্ত করতে বল, দেখা হবে

না, যাও—নতদৃষ্টি হইয়া নায়েব বাহির হইয়া গেল। এইরূপ বীরত্ব প্রকাশের পর মহীপতি বাবুর দুই চক্ষু তরুণীর উপর পড়িল। তরুণী তাহার দীর্ঘায়ত দুই চক্ষু মেলিয়া এই দাম্ভিক পুরুষটির পানেই চাহিয়াছিল; চোখোচোখী হইতেই সে নিবদ্ধ দৃষ্টিটুকু বিহসিত করিয়া প্রচ্ছন্ন বিদ্রুপের স্বরে বলিল,—পঞ্চাশ টাকার প্রজা হুজুরের কাছে আমোল পেলে না, কিন্তু এক টাকার প্রজাও দেবীপুরের রাজার সামনে আসতে বাধা পায়না।

মহীপতির সর্ব্বশরীরে কে যেন উত্তপ্ত সীসা ঢালিয়া দিল!

সে এবার তীক্ষ্ণস্বরে উত্তর দিল,—হ'তে পারে, কিন্তু ব্যবস্থা সবার সমান নয়। ভগবান যাকে ছোট করে জগতে পাঠিয়েছেন, তাকে সেই ভাবেই দাবিয়ে রাখা হচ্ছে শক্তিমানের কায।

তরুণী মৃদু হাসিয়া বলিল,—মাপ করবেন, কথার পীঠে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—এই ছোটই যদি হঠাৎ শক্তিমান হয়ে মাথা তুলে জগতের সামনে দাঁড়ায়, তাহ'লে তাকে দাবিয়ে রাখা কার কায হ'বে হুজুর?

মুখখানা কঠিন ও কণ্ঠের স্বর তীক্ষ্ণ করিয়া হুজুর উত্তর দিল,—আমাদের মত শক্তিমান জমিদাররাই তখন পয়জার মেরে তাদের সায়েস্তা করবে।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—হুজুর বনেদী বংশের জমিদার কিনা, তাই 'বুর্জ্জোয়া'-ভাবটুকু ভাল করেই শিক্ষার সঙ্গে আয়ত্ত করেছেন।

মহীপতি গর্ব্ব ভরে জানাইল,—ছেলেবেলা থেকেই, আমরা এ শিক্ষা পেয়ে আসছি। আমি যখন স্কুলে যেতুম, আমার জন্য আলাদা চেয়ার থাকত। দুজন বরকন্দাজ আমার পেছনে দাঁড়িয়ে পাহারা দিত—

তরুণীর আননের স্বাভাবিক হাসিটুকু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অস্ফুটস্বরে যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বলিয়া ফেলিল,—জোড়া বরকন্দাজ! পাছে কেউ কান মলে দেয় এই ভয়ে বুঝি? ওঃ—এই নিয়েই বুঝি দীননাথ বাবুর সঙ্গে হুজুরের মন কষাকষি?

আর যায় কোথায়, একটি বিস্ফোরক বোমা যেন সশব্দে বিদীর্ণ হইল! মর্ম্মর টেবলের উপর প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়া মহীপতি বাবু হাঁকিলেন,—'দারোয়ান!' ধৈর্য্যের বন্ধন ছিন্ন হইলে তিনি এমনই ভীষণ হইতেন।

তরুণীর সমগ্র আননে তখন হাসির তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই সঙ্গে কণ্ঠের স্বরও উচ্চ গ্রামে তুলিয়া সে বলিল,—থামুন থামুন! দারোয়ান ডাকতে হবেনা, আমরা চোর ডাকাত বা মেয়ে বোম্বেটে নই! আমরা আপনার

সঙ্গে লড়াই করব না নিশ্চয়ই! আপনি শান্ত হোন, আমরা বিদায় নিচ্ছি; দাদু ওঠো—

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া হাসিমুখেই বলিলেন,—কিছু মনে করবেন না হুজুর, আমার নাতিনীটির কথার ধরণই এই রকম, মুখখানা এর ভারি আলগা; যাই হোক, এখন যাই; কিছু মনে করবেন না যেন! কথাগুলি এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া তিনি তরুণীর হাত ধরিলেন, যাইবার সময় দ্বারপ্রান্ত হইতে তরুণী পুনরায় সেই দুষ্টুমীর হাসিটুকু ওষ্ঠপ্রান্তে ফুটাইয়া বলিল,—কিন্তু লাইব্রেরীর মিটিংএ যোগ দিতে ভুলবেন না যেন!

সকলের স্তব্ধ দৃষ্টি সেই দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।

সাত

কোন একটা বিশিষ্ট লগ্নে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বাকড়া লাইব্রেরীর সাধারণ সভায় তাহার প্রবন্ধ পড়িতে উঠিয়াছিল। তাহার ন্যায় তরুণ লেখকের প্রবন্ধ যে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাদ উপস্থিত করিবে এ কথা কেহই তখন কল্পনাও করে নাই। সভা ভঙ্গের পর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গ্রামময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। সভায় শ্রোতার সংখ্যা ছিল মাত্র দুই তিন শত, কিন্তু আন্দোলনের কল্যাণে দুই তিন হাজার লোকের মধ্যে প্রবন্ধের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

দীননাথের প্রবন্ধের মর্ম্ম এই যে, দেশের যে সব লোক আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পরিশ্রমের বিনিময়ে উপার্জ্জন করিয়া থাকে তাহারাই প্রকৃত বড়লোক। আর যে সব ধনবান লোকের পুত্রগণ পিতৃপুরুষের অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের আশ্রয় লইয়া নবাবীর চূড়ান্ত করিয়া থাকে, তাহারা কখনই বড়লোক বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পুত্র গণ্ডমূর্খ হইলে যেমন সে পিতার পাণ্ডিত্যের দাবী করিতে পারেনা, তদ্রূপ ধনাঢ্য পিতার অক্ষম নির্গুণ পুত্র কখনই ধনী বড়লোক পদবাচ্য হইতে পারেনা।

ফলে দীননাথের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে দুইটি দলের সৃষ্টি

হইল। একদল বলিল—অতি সত্য কথাই বলা হয়েছে। অপর দল বলিল,—পুরা বলশেভিক আইডিয়া নিয়ে বড়লোক-দের খর্ব্ব করা হয়েছে।

দুর্ভাগ্য দীননাথ বেচারী স্বাভাবিক ভাবধারার প্রেরণায় এই প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল। সে তখন স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই যে, প্রবল প্রতাপ জমিদার মহীপতি মখুজ্জ্যে তাহার দীন প্রবন্ধের আলোচনার বস্তু হইবেন। কিন্তু যখন তাহারই গুণমুগ্ধ হিতৈষীগণ অপরূপ টিকাটিপ্পণীর সহায়তায় মহীপতি বাবুকেই প্রবন্ধের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল; পক্ষান্তরে, জমিদারবাবুর অনুগৃহীত ভক্তবৃন্দ এই তিল প্রমাণ ব্যাপারটিকে তালে পরিণত করিয়া একটা প্রকাণ্ড ঘোঁট পাকাইয়া তুলিতেছিল, তখন দীননাথকে যুগপৎ চমৎকৃত ও চমকিত হইতে হইল। মহীপতির প্রকৃতি দীননাথ বাল্যকাল হইতেই ভালরূপে জানিত, সুতরাং তাহার উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না যে, এইবার তাহার কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত।

দীননাথের প্রকৃতিটি ঠিক স্বাভাবিক ও সাধারণ ধাতুতে গঠিত হয় নাই। এই সদানন্দ সদাপ্রসন্ন নির্ম্মলহৃদয় সুস্থ সবল মানুষটির মনের মধ্যে কোনও অশান্তিকর বিক্ষোভ ক্ষণমাত্র স্থান পাইত না। সংসারে হাজার হাজার মানুষের

মধ্যে কদাচ এমন এক-একজন মানুষ দেখা যায়, যাহার ডিক্রীজারীতেও উল্লাস নাই, ডিসমিসেও বিষাদ নাই। দীননাথ ঠিক সেই প্রকৃতির মানুষ। ঘোর দুর্দ্দিনে বিপদ বা অভাবের সময়ও তাহার স্বাভাবিক সদা-প্রফুল্লভাব তাহার অন্তরঙ্গদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিত। যখন দীননাথ বুঝিল, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে আর ফিরিবে না; তখন এ সম্বন্ধে যাহা কিছু চিন্তা সমস্তই ভবিতব্যের উপর সর্ব্বান্তকরণে সমর্পণ করিয়া মুক্তপ্রাণে সে আপনার কার্য্যে লিপ্ত হইল।

মহীপতি বাবু পুরুষানুক্রমে জমিদার এবং বড়লোক। তাহারাই পিতৃক অর্থের রীতিমত সুযোগ লইয়া যাহার পিতৃপুরুষ মানুষ হইবার যোগ্যতা পাইয়াছে, আজ কিনা তাহাদেরই অধস্তন দীননাথ নায়েক হইয়া সভার মাঝে প্রবন্ধ পড়িয়া তাহাকেই আক্রমণ করিয়াছে! গ্রামের জমিদার সমাজের মাথা, তাহাকে লইয়া মস্করা? কলমবাজী?

ভজহরি বিজ্ঞের মত ভণিতা করিয়া বলিল,—এই সব ভেবে আগেই বলেছিলাম বুড়োকে রুখতে; হুজুর তখন তাতে গা' করলেন না,—বুড়োর বেহায়া মক্কা মেয়ের পাকা পাকা কথা শুনেই থেমে গেলেন।

মহীপতি বলিল,—বুড়োকে রুখলে কি এমন গঙ্গামণ্ডল রক্ষা হ'ত শুনি?

ভজহরি বলিল,—হুজুর ত মিটিং দেখতে যাননি, বুঝবেন কি বলুন! দীননাথ যেই প্রবন্ধ পড়তে আরম্ভ করলে, তখন কি হাততালির ধূম! আর হুজুরের নাম নিয়ে চারদিক থেকে কি 'সেম' 'সেম' শিকার! যেন সবাই মিলে ধনুকে টঙ্কার দিলে! আর ঐ বুড়ো-বেটার মুখ টিপে টিপে হেসে দাড়ী দুলিয়ে ফিস ফিস করে দুলালী নাতনীর সঙ্গে কত কি কথা; দাদু-নাতনী যে খুব খুসী হয়েছিল, তা দেখেই বুঝা গিয়েছিল। হুজুর যদি তখন রুখতেন, এতটা হ'ত না, হ'য়ত মিটিংই বসতনা।

মহীপতির মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। ভজহরির দিকে তাকাইয়া উদাসভাবে বলিল,—যা হবার হ'য়ে গেছে, তা নিয়ে অনুতাপ ক'রে এখন কোনও লাভ নেই। এর প্রতীকারের ব্যবস্থা করাই আমাদের এখন কর্ত্তব্য।

ভজহরি সোৎসাহে বলিয়া উঠিল,—নিশ্চয়, এর এমন প্রতীকার করতে হ'বে হুজুর, যাতে সমস্ত গ্রাম টিট হ'য়ে যায়। জমিদারের সঙ্গে ঠাট্টা মস্করার কি পরিণাম, সেটা সকলকেই বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।

মহীপতি সহসা সাগ্রহে প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, বুড়ো আমার সম্বন্ধে ইঙ্গিত আভাসে কিছু বলেছে?

ভজহরি বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিল,—রামঃ! বুড়োকে তেমনি কাঁচা লোক পেয়েছেন কিনা! ভাঙ্গে ত মচকায় না।

দীননাথ যখন প্রবন্ধ পড়ে, তখন হুজনের কি হাসি! কিন্তু বুড়ো শেষকালে বক্তৃতা করতে উঠে এ সবের ধার দিয়েও গেলনা। লাইব্রেরী কি করে সৃষ্টি হ'ল, এর কত দরকার, তারপর—লেখাপড়া, মেয়েদের শিক্ষা, পল্লীসমাজের কথা, দেশের কথা, এই সব কত কি আবল তাবল বকে গেল,—কিন্তু দীনোর প্রবন্ধর দিক দিয়ে ভুলেও একটি কথা বলেনি, এটা সত্যি! হ্যাঁ শেষকালে বুড়ো একটি কথা হুজুরের সম্বন্ধে বলেছিল যে, গ্রামের জমিদার এ উৎসবে যোগ দিলে উৎসবটি পরিপূর্ণ হত। কিন্তু তখনই হুজুর চারদিক থেকে আবার সেই 'সেম' 'সেম' শব্দ উঠে বুড়োর মুখ বন্ধ করে দিলে।

মহীপতি বাবুর মুখখানার প্রসন্নতার ঈষৎ আলোকপাত হইতে না হইতে, শেষোক্ত সংবাদে আবার তাহার উপর অন্ধকারের গাঢ় প্রলেপ পড়িয়া গেল।

ঠিক এই সময় দেওয়ান কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহীপতি ও ভজহরি নির্ব্বাক বিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দেওয়ানের পশ্চাতেই বৃদ্ধ রাজকবি, পার্শ্বে সেদিনের প্রগলভা তরুণী।

মহীপতির অন্ধকারময় মুখমণ্ডলে একবার বিজলি চমকিল। তরুণী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিল,—আজ বোধ হয় আর বস্‌বার জন্ম হুজুরের অনুমতির অপেক্ষা কর্‌তে হবে না; আসুন দাদু, বসি।

তরুণী ক্ষিপ্রহস্তে মহীপতির টেবলের সম্মুখস্থ একখানি সোফায় দাদুকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, আর একখানি সোফায় স্বচ্ছন্দে বসিয়া পড়িল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া মহীপতি দেওয়ানের দিকে চাহিল। তরুণী পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মহীপতির দিকে তাকাইয়া স্মিত হাস্যে বলিল,—ওঁর কোন অপরাধ নেই, বিনা এত্তেলায় উনি আমাদের আনতেই চান নি; আমিই একরকম জোর করে ওঁকে আমাদের এখানে আনতে বাধ্য করেছি। সুতরাং এর যা শাস্তি তা আমরা বহন করতে প্রস্তুত আছি।

মহীপতি রাজকবির দিকে চাহিয়া বলিল,—কি মনে করে আপনাদের এখানে আগমন?

বৃদ্ধ বলিলেন,—আমি বুঝতে পেরেছি, যে কোন কারণেই হোক হুজুরের কাছে আমি অপরাধী হয়েছি, আর হুজুরও আমার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এটাও বুঝেছি, এই অপ্রীতিকর অবস্থার কারণ হচ্ছে—সেদিনকার মিটিং। আমার ঐ মিটিংএ যোগ না দেওয়াই উচিত ছিল। শুনতে পাচ্ছি, দীননাথ বাবুর উপরও হুজুর খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এখন আমার এই প্রার্থনা, হুজুর দয়া করে এর একটা মীমাংসা করে দিন,—যাতে রাজা-প্রজার এ ঝগড়া না বাড়বার ফুরসৎ পায়—একটা মিটমাট হয়ে যায়।

ভজহরি তর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিল,—হুঁ! গোড়া কেটে এখন আগায় জল।

মহীপতি একবার ভজহরির দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া তৎপর বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিল,—এর আবার মিটমাট কি? কয়েকটা কুকুর আমার দিকে তাকিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চীৎকার ক'রেছে,—সেই কুকুরদের সায়েস্তা করবার মত চাবুক আমার আছে, আর চাবুক হাঁকরাবার চাকরের অভাবও আমার নেই।

তরুণী হাসিয়া বলিল,—তা বলে দেখবেন হুজুর, যেন আমাদের ওপরেই হাঁকরাবেন না।

মহীপতি তরুণীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া পরক্ষণেই বৃদ্ধের মুখের উপর দৃষ্টি ফেলিয়া জিজ্ঞাসিল,—আপনার এই নাতনীটি সব বিষয়েই বেপরোয়া দেখছি। এঁর নামটা কি শুনি?

বৃদ্ধ বলিলেন,—ওর নাম একটা অবশ্যই ছিল কিন্তু রাজা বাহাদুর আদর করে নাম দিয়েছেন—'রাজকন্যা'!

ভজহরি নয়ন বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল,—বটে! কাণা পুতের নাম যেমন পদ্মলোচন!

এই মেয়েটার উপর ভজহরি খুবই চটিয়াছিল, কাযেই সুযোগ পাইয়া এই অশোভন টিপ্পনী প্রয়োগের প্রলোভন সে সম্বরণ করিতে পারিল না। তরুণীর আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু সংযতস্বরে সেও বলিয়া উঠিল,—ঠিক বলেছেন আপনি, যেমন

এই আকড়ার মত একটা জমিদারীর মালিকের নাম মহীপতি আর তাঁর স্তুতিবাদকের নাম ভজহরি,—তেমনি তুচ্ছ এক নায়েবকন্যার নামও 'রাজকন্যা'।

মহীপতির মুখখানা আবার অন্ধকার হইল। দেওয়ান মুখ টিপিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিলেন। ভজহরি মুখ ফিরাইয়া বসিল। এই স্পষ্টবাদিনী মুখরা মেয়েটির ভয়ডরহীন তীক্ষ্ণ কথাগুলি এ হেন দৃঢ়চেতা দাম্ভিক জমিদারটির গাম্ভীর্য্যময় মজলিসের বিশাল বক্ষ যেন ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।

রাজকন্যা শান্তভাবে বলিল,—দাদু, তা'হলে চলুন আমরা যাই, হুজুর ত মিটমাট করবেন না, উনি ত চাবুক দেখিয়ে দিলেন।

উত্তেজিতভাবে এইবার মহীপতি বলিয়া উঠিল,—মিট-মাটের জন্য তোমাদের এত মাথা ব্যাথা কিসের? আর মেয়ে মানুষ হয়ে তুমিই বা এর মধ্যে কেন মাথা দিতে এসেছ শুনি? তোমাদের ব্যবহার আমাকে স্তম্ভিত করেছে।

আবার সেই দুষ্টমীর হাসির মধ্যে রাজকন্যা বলিল,—দীননাথ বাবুর লেখার চেয়েও?

সারোষে মুষ্টিবদ্ধ হস্ত টেবলের উপর চাপিয়া ধরিয়া মহীপতি বাবু বলিল,—সেই কুকুরটাকে তিন দিনের মধ্যে আমি মুগুর দিয়ে চূর্ণ করব।

রাজকন্যা উভয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—এবার মুগুর? চাবুকে বুঝি সুবিধা হ'লনা। এখন আপনার আর দুটো প্রশ্নের উত্তর দিতে বাকি আছে। শুনবেন কি?

মহীপতি অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল,—বলতে পার।

রাজকন্যা বলিল,—দাদু সেই মিটিংএর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন কিনা, মিটিংএর ফলে কোন কিছু গোলযোগ উঠলে সভাপতিরই উচিত তার মিটমাট করে দেওয়া; তাইতেই এ ব্যাপারে আমাদের এত মাথা ব্যাথা—শুনলেন? আর আমার সম্বন্ধে যা বল্‌লেন তারও উত্তর দিচ্ছি;—বড় লোকের বড় মেজাজের বিরুদ্ধে গরীবের একটা মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে দেখে, সেই মূল্যবান মাথাটাকে বাঁচাইবার জন্য মেয়ে মানুষকে মাথা দিতে হয়েছে।

মহীপতির গম্ভীর মুখখানার ভিতর দিয়া একটা স্বর বাহির হইল,—হুঁ! তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা সে বলিয়া উঠিল,—আমি রাজাকে আপনাদের এই অনধিকার চর্চ্চার কথা জানাব।

মুখ টিপিয়া হাসিয়া রাজকন্যা বলিল,—স্বচ্ছন্দে! না হয়, রাজা আমাদের মাসোহরা বন্ধ করে দেবেন, এই ত?

বৃদ্ধ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল,—দোহাই হুজুর! অমন কাযটি করবেন না, এ ক্ষেপা মেয়ের কথায় উষ্ণ হয়ে আপনি যেন এই বৃদ্ধকে শেষ

বয়সে পথে বসাবেন না। কি বলছ দিদি তুমি, এত বুদ্ধিমতী হয়ে ?

মুখের হাসিটুকু যেন জোর করিয়া মুখেই মিলাইয়া রাজকন্যা বলিল,—আচ্ছা দাদু, আর আমি কিছু বলব না। আমার ঘাট হয়েছে।

এই সময় পেস্কার শশব্যস্তে আসিয়া সংবাদ দিল,—মিলের সাহেব ম্যানেজার দেখা করতে এসেছেন।

তাঁহাকে আনিবার হুকুম দিয়া মহীপতি বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,—বসুন একটু ; এখুনি দেখবেন যে, ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতায় যে ক্ষমতাবান্, তার পক্ষে তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চূর্ণ করবার সুযোগ আপনি এসে যায়।

এক প্রবীণ বয়স্ক ইংরাজ দ্বারদেশ হইতে বলিলেন,—ভিতরে আসতে পারি স্যার ?

আসিবার আদেশ দিয়া মহীপতি হাত বাড়াইয়া দিল। করমর্দন পালা সাঙ্গ করিয়া আগন্তুক আসন গ্রহণ করিলেন।

মহীপতি বাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ইংরাজ ভদ্রলোকটির দিকে চাহিল।

তিনি একখানি মুসাবিদা বাহির করিয়া জমীদারবাবুর হস্তে দিয়া বলিলেন,—ড্রাফ্‌ট তৈরী হয়ে গেছে, এখন স্যার মঞ্জুর করলেই দলীলে চড়িয়ে রেজেষ্টারী হবে।

মুসাবিদাখানার উপর একবার চোখ বুলাইয়া মহীপতিবাবু বলিল—দেখুন মিষ্টার হুইলার, আমার আর কোন আপত্তি এতে নেই, মিল বাড়াবার জন্য যখন জমী আপনাদের দরকার এবং আপনারা তার উপযুক্ত নজরানা ও খাজনা দিতে প্রস্তুত, তখন এতে আর কথা কি? কিন্তু শুধু একটি সর্ত্ত আপনাকে এই ড্রাফটে সংযোগ করতে হবে।

উৎকণ্ঠিত ভাবে ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিলেন,—সে সর্ত্তটি কি?

মহীপতিবাবু গম্ভীর ভাবেই জানাইল,—ব্যস্ত হবেন না বলছি। আচ্ছা, মিষ্টার হুইলার, আপনাদের মিলে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় বলে একটা ছোকরা চাকরী করে না, জুট ডিপার্টমেণ্টে?

ম্যানেজার একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন.—জুট ডিপার্টমেণ্টে দীননাথ—চাকরী—ও হো—হয়েছে; জুটমার্চ্চেণ্ট দীননাথ বাবু! তিনি কি এই নগরেরই অধিবাসী নন?

মহীপতি বলিল,—হাঁ, এইখানেই তার বাড়ী।

ম্যানেজার উল্লাসভরে বলিলেন,—হাঁ, তাঁকে খুব জানি, তবে তিনি আমাদের মিলে চাকরী ত করেন না, জুট সাপ্লাই করেন, এই একমাত্র বাঙ্গালী জুট মার্চ্চেণ্টের সংস্রব আমাদের মিলে এখনও আছে।

মহীপতি বলিল—আপনি কি এ খবর রাখেন মিষ্টার হুইলার,

যে, এই ব্যক্তি আপনদের মিল থেকে প্রতি সপ্তাহে প্রচুর পরিমাণ টাকা উপরী উপায় করে,—অর্থাৎ চুরী করে?

বিস্ময়ে অবাক হইয়া ম্যানেজার বলিয়া উঠিলেন,—চুরী করে? বাবু দীননাথ? এ হতেই পারে না। স্যার, আপনি ভুল সংবাদ শুনে থাকবেন। আপনি বোধ হয় জানেন না স্যার, এ পর্য্যন্ত যে কোন সূত্রেই হোক, মিলের সংশ্রবে যারা এসেছেন, এই দীননাথ তাঁদের মধ্যে একমাত্র সাধু ব্যক্তি। তাই আমাদের অফিসে এঁর নাম রটেছে সাধু দীননাথ। আমাদের মিলের ডাইরেক্টররা বাঙ্গালী পাটওয়ালাদের কাছ থেকে পাট নেওয়া একরকম একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। তার কারণ, এঁরা প্রচুর চুরী করতেন,—তাইতে এখন দেশী পাটওয়ালারা সস্তায় পাট দিলেও তাদের পাট নেবার হুকুম নেই। শুধু দীননাথবাবু এখন পর্য্যন্ত সম্মানের সঙ্গে টেঁকে আছেন।

মহীপতি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—এ যে চুরী করছে না, তার সম্বন্ধে তদন্ত আপনারা কিছু করেছেন?

ম্যানেজার হাসিয়া বলিলেন,—আপনি স্যার জমিদার, আপনার কর্ম্মচারীদের কোথায় কোনখানে কি ভাবে গলদ হবার সম্ভাবনা তা যেমন আপনি জানেন,—আমিও তেমনি মিলের ম্যানেজার, সব ডিপার্টমেণ্টে আমাকে চোখ রাখতে হয়। মিলে যে চুরী হয় না, তা আমি বলছি না, প্রতি হপ্তায় এত চুরী হয়

যে, তা বলবার কথা নয়,—কিন্তু সহসা সে সব চুরীর পথ বন্ধ করবার উপায় নেই ; তবে আমাদেরও চোখ ফুটেছে আস্তে আস্তে, সবই ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে যাবে। এখন আমাদের সমস্ত চোখ জুটের দিকেই পড়েছে, কেন না, মোটা মোটা চুরী হত এইখানে। দীননাথবাবুর কথাবার্ত্তা শুনে ও চালচলনে মুগ্ধ হয়ে আমরা তাঁকে বহাল রেখেছিলাম বটে, কিন্তু পেছনে গোয়েন্দা রাখতে কসুর করিনি। অনেক সময় গোয়েন্দাদের দিয়ে খুব কৌশলে আমি পরীক্ষাও করেছি। হাজার হাজার টাকা এক এক চালানে উপায় হবার প্রলোভনও দেখিয়েছি, কিন্তু ঐ বাবু কিছুতেই টলে নি। আমি এঁকে মনুষ্য সমাজের গৌরব বলে শ্রদ্ধা করি।

ম্যানেজারের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মহীপতির মুখখান যেন ফ্যাকাসে হইয়া গেল। যাহাকে সে কীটের ন্যায় পদদলিত করিতে উদ্যত, সেই সময়েই কিনা এই ইংরাজ দেবতার আসনে তাহাকে বসইয়া তাহার প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ ! বিরক্তির স্বরে মহীপতি বলিল,—আপনি এখন অনুগ্রহ করে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন। আমার এত সব শোনবার বিশেষ অবসর নাই। এখন আমার সর্ত্তের কথা শুনুন। এই দীননাথ চ্যাটার্জ্জীকে কখনও আপনারা মিলের সংশ্রবে রাখতে পারবেন না, তার স্থলে আমার এই লোক, ভজহরি ভট্টাচার্য্য আপনাদের জুট সাপ্লাই করবে, এই হচ্ছে আমার নূতন সর্ত্ত !

বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে ম্যানেজার কিছুক্ষণ মহীপতিবাবুর

দিকে চাহিয়া তাহারপর ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন—আপনি কি পরিহাস করছেন স্যার ?

মহীপতিবাবু দৃঢ়স্বরে বলিল,—জমিদার কখনও প্রজার সহিত পরিহাস করেন না।

ইংরাজ ম্যানেজার কিছু ক্ষুন্ন হইয়া বলিল,—তাহলে আপনি কি আমাকে এই আদেশ করতে চান যে, আপনাদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মনোমালিন্যের ফলে, আপনার স্বার্থকে পরিপুষ্ট করবার জন্য আমি আমার এত বড় একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিকে অন্যায় ভাবে চূর্ণ করি ?

মহীপতি স্থির সংযতস্বরে উত্তর দিল,—সে আপনি বুঝবেন। আমার কথা এই যে, আমার জমি নেওয়া আপনারা যদি একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন, আমার সর্ত্ত আপনাদের মানতেই হবে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ম্যানেজার বলিলেন,—কিন্তু এই বাবুকে ত আমি চিনি না। এঁকে—”

বাধা দিয়া মহীপতিবাবু বলিল,—আপনি আমাকে বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারেন—আপনাদের দীননাথবাবুর চেয়েও ?

ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া ম্যানেজার বলিলেন,—তুলনার কথা ত হচ্ছে না, স্যার, আপনি জমিদার আপনাকে অবশ্যই আমরা বিশ্বাস করি !

মহীপতি দৃঢ়স্বরে বলিল,—তাহলে এই ভজহরি ভাট্টাচার্যকেও আপনি বিশ্বাস করবেন। এ আমার লোক, এর জন্য আমি দায়ী। ম্যানেজার বলিলেন,—উত্তম। কিন্তু স্যারকে এর জন্য জামীন নামা লিখে দিতে হবে।

মহীপতি বললে,—তাই হবে।

ম্যানেজার উঠিলেন। যাইবার সময় গাঢ়স্বরে বলিয়া গেলেন, আমরা সাগর পার হয়ে এদেশে রোজগার করতে এসেছি, কোম্পানীর স্বার্থ দেখতে আমরা আগে বাধ্য। কোম্পানীর স্বার্থের অনুরোধেই আমাকে এমন অন্যায় কায করতে হল। কম্পিত করে একথা আমাকে লিখে দীননাথকে জানাতে হবে। তার এত বড় একটা আয়ের পথ সহসা রুদ্ধ হয়ে গেল! কিন্তু এর জন্য দায়ী আমি নই, দায়ী তার দেশবাসী ভাই। ঈশ্বর তা বুঝেছেন। কিন্তু স্যার, আপনাকে বলে যাচ্ছি আমি, চল্লিশ বছর পাটকল চালিয়ে অনেক দেখেছি, আর দেখে শিখেছি—অন্যায় কখনও ন্যায়কে জোর ক'রে দাবিয়ে রাখতে পারে না। সাধু দীননাথকে আপনি এভাবে দাবাতে পারবেন না, বরং সেই একদিন আপনাকে দাবাবে।

সেদিন আর মজলিস জমিল না। নাতিনীটিকে লইয়া বৃদ্ধ যখন বিদায় লইয়া উঠিয়া গেলেন, তখন তাঁহাদের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবারও স্পৃহা মহীপতিবাবুর ছিল না।

আট

যাহাকে উপলক্ষ করিয়া এত সব উদ্যোগ আয়োজন, সেই সাধারণ মানুষটি কিন্তু দিব্য নির্ব্বিকার ও নিশ্চিন্ত মনে স্বাভাবিক প্রেরণার বশেই নিজের অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইয়া রহিল। জমিদারের ক্রোধ-বিদ্বেষ, জমিদার-সুলভ প্রতিপত্তির প্রভাবে কর্ম্মহানি, আয়ের উপায় বিলোপ,—কোন কিছুই তাহাকে উত্তেজিত বা অবসন্ন করিতে পারিল না।

এই সমৃদ্ধ সুবৃহৎ গ্রামখানির যে অংশ ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হইয়া বহুদূরব্যাপী সুবিশাল জলাভূমির সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই অংশেই দীননাথের পৈতৃক ভদ্রাসন। দীননাথ তাহার রুচি অনুসারে পৈতৃক বসতবাটীকে সুসজ্জিত ও সৌষ্ঠব মণ্ডিত করিয়া লইয়াছে। তোরণ পথের দুই পার্শ্বে সুবিস্তৃত পুষ্পবিথীকা, তাহার পরেই উলুর ছাওয়া চালযুক্ত সুবৃহৎ পর্ণশালা, এই পর্ণশালায় দীননাথের কর্ম্মশালা বিদ্যমান। দক্ষিণদিকের পাঠশালায় কয়েকখানি তাঁত স্থান পাইয়াছে, বামদিকের পর্ণশালায় চরকা, সুতা ও রং করিবার সাজ-সরঞ্জাম। ইহার পার্শ্বেই অন্দর মহলের দরজা। একটি ছোট অঙ্গনের তিন দিক বেড়িয়া খোলার ছাদযুক্ত কয়েকখানি খট খটে ঘর ও দালান,—একদিকে রন্ধনশালা মধ্যস্থলে ভাঁড়ার ও অন্য দিকে শয়ন কক্ষ; অঙ্গনের মধ্যস্থলে বড়

বড় দুইটি মরাই বা ধানের গোলা, দুইটি গোলাই ধান ও নানাবিধ শস্যেপূর্ণ। বাগানের একপ্রান্তে কৃষিশালা,—গোলপাতার ছাওয়া ঘরে যথাক্রমে কৃষি-যন্ত্রপাতি, কৃষাণ ও গোকুলের থাকিবার স্থান ও অঙ্গন।

বৃদ্ধ রাজকবি ও তাঁহার নাতিনী সেদিন পূর্ব্বাহ্নেই দীননাথের এই ক্ষুদ্র কর্ম্মশালা, উদ্যান, পুষ্করিণী, শস্যের গোলা প্রভৃতি তন্নতন্ন করিয়া দেখিয়া যখন দালানে আসিয়া প্রসারিত ফরাসের উপর ক্লান্তভাবে আশ্রয় লইলেন, ঠিক সেই সময় দীননাথ সেইখানে আসিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—এই যে দীননাথবাবু, আসুন, আমরা আজ আপনার অতিথি।

সঙ্গে সঙ্গে রাজকন্যা হাস্যোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, —ঘণ্টা দুই ধরে আমরা আপনার কর্মশালা দেখে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

অঞ্জলীবদ্ধকরে দীননাথ বিস্ময়োল্লাসে বলিল,—আমার আজ একি সৌভাগ্য যে, আমার মত দরিদ্রের ঘরে—

সহজ সরল হাস্যে রাজকবি বলিলেন,—আমরাও যে দরিদ্র দীননাথবাবু! বড়লোক না হ'লেও মানুষ আমরা, তাই মানুষের বাড়ীতে এসেছি। আপনিও ক্লান্ত হ'য়ে এসেছেন দেখছি,—বসুন।

অজানা অতিথি

দীননাথ কুণ্ঠিতভাবে ফরাসের একপার্শ্বে বসিয়া সবিনয়ে বলিল,—আমি আপনার পুত্রতুল্য রাজকবি! আমাকে যদি 'আপনি' বলে কথা কন, তাহ'লে আমাকে শুধু লজ্জা দেওয়া নয়—পল্লী-সমাজের চিরাচরিত সৌজন্যকে ক্ষুণ্ণ করা হয়।

হাসিয়া রাজকবি বহিলেন,—কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু আজকালের আন্তরিকতা ক্রমশই পরস্পরের মধ্যে থেকে এমনভাবে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে যে, শ্লীলতা জিনিষটা ক্রমেই ভয়াবহ হ'য়ে উঠছে! মৌখিক মর্য্যাদা আর বাহ্য সম্মান আদায় করবার জন্যই এখন নব্য সমাজকে খুব লোলুপ বলেই মনে হয়।

রাজকন্যা বলিল,—এই দেখুন না, মহীপতি বাবুকে কথায় কথায় 'হুজুর' না বল্লে তিনি চটে যান! তা তাঁর পক্ষে চটা নিতান্ত অন্যায়ও নয়, কেননা, তিনি হচ্ছেন দেশের জমিদার বড়লোক। আপনি আবার বড়লোকের ওপর কলম ধরেছেন, তাইতে আমি ত' এতক্ষণ ভেবেই সারা হচ্ছিলাম যে, আপনাকে আরও কি উঁচু সম্বোধন করা যেতে পারে! এখন জেনে সুখী হ'লুম, আপনি এ সবের মোটেই পক্ষপাতী নন। এ সব বলা কি কোনও ভদ্রলোকের পোষায়? আপনিই বলুন ত?

সহজ সুরে দীননাথ বলিল,—যিনি ভদ্রলোক, তিনি

এসব বলবেনই বা কেন? সামান্তকে বড় ব'লে প্রচার করা অন্যায়, অপরাধ, ‍তোষামদ।

রাজকন্যা কিছু গম্ভীর হইয়া বলিল—আর বড়কে সামান্য বলে উপেক্ষা করা?

দীননাথ বলিল,—সে অন্যায়। বড় যদি নিজে ছোট হ'য়ে নিজকে সামান্য বলে [illegible] করেন, সে তাঁর মহত্ব। কিন্তু অন্যে যদি তাঁর মহত্বকে খর্ব্ব করবার প্রয়াস পায়, সে তার নীচতা।

উৎফুল্ল হইয়া রাজকন্যা বলিল,—হাঁ, এইবার পথে আসুন ত মশাই! বলুন ত এবার, প্রবন্ধ লিখে যিনি বড়লোকদের খর্ব্ব করতে চান, সেটা তাঁর পক্ষে কি?

পূর্ব্ববৎ সরল সহজ ভাবেই দীননাথ বলিল,—সেও নিশ্চয় নীচতা,—অবশ্য যদি ব্যক্তিগত ভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থবসে নির্দ্দিষ্ট কোন বড়লোককে খর্ব্ব করবার চেষ্টা হয়ে থাকে।"

হাসিয়া রাজকন্যা বলিল,—আশ্চর্য্য! আপনি ত অদ্ভুত মানুষ দেখছি! আপনি এতবড় কথাটাও নিজের ওপর প্রযোজ্য মনে ক'রে চটে লাল হ'য়ে উঠলেন না ত?

দীননাথ বলিল,—চটে যে কায করা যায়, উত্তেজনায় যেটা গড়ে ওঠে—তাতেই চটাচটি আসে।

তাহলে আপনি বলতে চান, স্বাভাবিক প্রেরণাতেই আপনি

আপনার প্রবন্ধ রচনা করেছেন,—ব্যক্তিগতভাবে মহীপতি বাবুকে আক্রমণ করেন নি?

দীননাথ এতক্ষণে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তরুণীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর রাজকবির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বেশ স্বাভাবিক স্বরেই বলিল,—আশা করি, মহীপতিবাবুর পক্ষ থেকে আমার কাছে এ কৈফিয়ৎ চাওয়া হচ্ছেনা!

বৃদ্ধ হাস্যমুখে বলিল,—এ কথার মানে কি, দীননাথবাবু?

দীননাথ গাঢ়স্বরে বলিল,—এই প্রবন্ধকে উপলক্ষ করে মহীপতিবাবু অতর্কিত ভাবে আমাকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর তূণে যতগুলি বাণ ছিল, সমস্তই আমার ওপর ছুঁড়েছেন; তা ছাড়া তাঁর বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আমাকে বধ করতে উদ্যত হ'য়েছেন। সুতরাং এ অবস্থায় তাঁর পক্ষীয় লোকের কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়াটা ভীতির নিদর্শন বা কাপুরুষতার লক্ষণ বলে মনে হ'তে পারে।

রাজকন্যা বলিল,—এতে পক্ষাপক্ষ কিছু নেই, আমি কেবল কৌতূহল বশেই কথার সূত্রে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছি। যদি একে আপনি কৈফিয়ৎ বলে মনে করে থাকেন, বলবার প্রয়োজন নেই।

দীননাথ ধীরস্বরে বলিল,—মহীপতিবাবুর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে কোন বিদ্বেষ আমার থাকতে পারেনা, নাইও!

তবে আমি এই গ্রামেরই ছেলে। আমার—গ্রামের আমার দেশের উন্নতির পথ, মুক্তির পথ নির্ণয় করবার অধিকার অবশ্যই আমার আছে। দেশের চাষী ও শিল্পীর দল আভিজাত্যের গণ্ডীর শত হস্ত দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে শ্রদ্ধায় পূজা উপচার যোগাবে আর অভিজাত-সমাজ তাদের উপেক্ষা করবে —এ আমার অসহ্য। এই জাতীয় অভিজাতবর্গের বিরুদ্ধেই আমার আন্দোলন। এই রকম অভিজাত বড়লোক—আমাদের দেশের প্রত্যেক গ্রামেই আছে। শুধু মহীপতিবাবুকে লক্ষ্য করিলে আমার প্রবন্ধ ছোট হয়ে যায়. বাঙ্গলাদেশের সমস্ত মহীপতির বিরুদ্ধেই আমার লেখা।

হাসিয়া রাজকন্যা বলিল,—আপনি দেখছি বাঙ্গলাদেশের লেনিন! তা দেখুন, দুঘণ্টা ধরে আপনার সমস্ত কীর্ত্তি দেখে নিয়েছি। আপনার লোকজনরাই সব দেখিয়েছে। তাঁতশালা, কৃষিশালা, গোশালা, গোলা, বাগান, পুকুর সবই দেখেছি। এ ত আপনার একখানি ছোটখাট রাজ্য বিশেষ! এখন এই দুঘণ্টার পরিশ্রমে আমরা খুবই ক্ষুধার্ত্ত হ'য়ে পড়েছি, বুঝলেন?”

ব্যস্তভাবে দীননাথ বলিয়া উঠিল,—এত আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা, আমি এখনই—

রাজকন্যা বাধা দিয়া বলিল,—কথটা শুনুন আগে, মশায়ের আগমন অপেক্ষায় বসে থাকবার মেয়েই আমি বটে!

বাগানের এমন টাটকা তরিতরকারী, পুকুরের মাছ, ঘরের গায়ের দুধ, এসবের লোভ সম্বরণ করা সোজা কিনা! নিজে সব তুলে কুটনো পর্য্যন্ত কুটে দিয়ে এসেছি, কি কি রান্না হ'বে তার পর্য্যন্ত ব্যবস্থা দিয়েছি,—পেটভরে গরম দুধ পান করেছি বুঝলেন! আজ যে আমরা আপনার অতিথি।

দীননাথ আনন্দে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিল,—বাবাজী, আমার এই পাগলী নাতিনীটির সবই অদ্ভুত! সবার সামনে বয়স্থা মেয়ের এরকম স্বচ্ছন্দভাব ও খোলাখুলি কথা তোমাদের চোখে হয়ত কিছু অদ্ভুত বলে মনে হ'বে, কিন্তু একে আমি ছেলেবেলা থেকেই এই ভাবে গড়ে তুলেছি। আমি এর সামনে কখনও কোন বিষয়ে সঙ্কোচের একটা পর্দ্দা খাটিয়ে দিইনি! সত্যই পাগলী দিদিটি তোমার কর্ম্মশালা আর গৃহস্থালী দেখে বড় খুসী হয়েছে। নিজের হাতেই শাকশব্জী তরিতরকারী তুলে এনে রাঁধবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসেছে; তোমার সংসারের সমস্তই আমরা জেনে নিয়েছি। পিতৃমাতৃহীন অসহায় দরিদ্রদের প্রতিপালনের জন্য কর্ম্মশালা গড়েছ, আত্মীয়া অসহায়া বিধবাদের যথাযোগ্য কায দিয়ে প্রতিপালন ক'রছ, এযুগে এর চেয়ে বড় কায আর কি হ'তে পারে? এ গ্রামে এ অঞ্চলে তোমার চেয়ে সত্যকার বড়লোক আর কে আছে? তোমার

এই কীৰ্ত্তি দেখেই পাগলী দিদি যেচে নিমন্ত্রণ নিয়েছে, আমিও তাতে সানন্দে সায় দিয়েছি। যাও দাদা, তুমি একবার বাড়ীর ভেতর ঘুরে এস। যাও দিদিমণি, তুমিও দেখেশুনে ব্যবস্থা সব করো।

স্বপ্নাবিষ্টের মত দীননাথ চাহিয়া রহিল। এই বৃদ্ধ ও তরুণীর কৃত্রিমতাশূন্য ব্যবহারে, অনাড়ম্বর আলাপে যুবক অভিভুত হইয়া পড়িল।

নয়

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দীননাথ দেখিল, সত্যই তাহার অপেক্ষা না করিয়াই ভোজের রীতিমত আয়োজন চলিয়াছে। উচ্ছ্বসিত হাস্যধারায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া রাজকন্যা বলিয়া উঠিল,—দেখছেন, বাগান থেকে সব লুটপাট করে এনে কেমন ভোজের জোগাড় করেছি?

এক বর্ষীয়সী মহিলা নিমকির লেচি বেলিতেছিলেন, তিনি উৎফুল্ল মুখে বলিলেন,—মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা! এক দণ্ডের মধ্যেই ঘর-বাড়ী আপনার করে নিয়েছেন!

যিনি কড়ায় নিমকি ভাজিবার জন্য ঘৃত চড়াইয়া আঁচের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—যেমন পাগলী-মেয়ে, তেমনই আমুদে দাদু, যেন বশিষ্ঠ ঋষি।

রাজকন্যা তাড়াতাড়ি উনানের নিকট গিয়া পাচিকার হাত হইতে ঝাঁঝরীখানি লইয়া বলিল,—দিন দিকিন আমাকে আমি খান কতক আগে ভাজি।

ওমা, সে কি? সোনার প্রতিমে তুমি, কেন কষ্ট—

বাধা দিয়া রাজকন্যা কলহাস্য করিয়া বলিল,—সোনার প্রতিমে আগুনের আঁচে কিছুতেই গলবে না,—দেখি ভাজতে পারি কিনা?

অজানা অতিথি

দীননাথ প্রশংসমান নয়নে এই তরুণীর অরুণারাগদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলেন।

নিমকি ভাজিয়া সহস্তে থালায় ভরিয়া, আসন পাতিয়া দিয়া রাজকন্যা দীননাথের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল,— এখন বসুন ত—

বিস্ময়ে দীননাথ বলিল,—সে কি? আগে আপনারা—

রাজকন্যা বলিল,—আমরা সকলেই সদ্ব্যবহার করব, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করবেন না, এই দেখুন, দাদুর জন্যও সাজিয়েছি; দাদু আমাকে না নিয়ে ত খান না, কাযেই আমাকে তাঁর সঙ্গে খেতে হবে। আপনি বসুন।

তরুণীর অবাধ স্বচ্ছন্দভাব, আন্তরিকতাময় আচরণ, কুণ্ঠাশূন্য, নির্মল প্রীতিপূর্ণ সহৃদয়তা দীননাথের অন্তর অভিভূত করিল। শৈশব হইতে দীননাথ মাতৃহীন, পাঠদ্দশায় পিতাকে হারাইয়াছে, ভাই, ভগিনী, আত্মীয় বলিতে কেহ তাহার নাই, পর লইয়া তাহার সংসার;—এই সম্পর্কশূন্য তরুণী অল্পক্ষণের পরিচয়ে তাঁহারই সংসারে অধিষ্ঠিত হইয়া কি মধুর মোহময় স্নেহধারায় তাহার চিত্তকে অভিষিক্তি করিয়া তুলিয়াছে! এ কোন্ মহিমময়ী দেবী, কোন্ স্বপ্নরাজ্য হইতে অমৃতের উৎস লইয়া তাহার বর্ত্তমানের ঘাতপ্রতিঘাতপূর্ণ প্রচ্ছন্ন উদ্বেগভরা হৃদয়মধ্যে পুলক স্পন্দন প্রবাহিত করিতেছে!

স্বপ্নাবিষ্টের মত দীননাথ আসনে বসিয়া পড়িল। জলযোগ অন্তে বৃদ্ধ রাজকবি ও রাজকন্যা সহসা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিল। বৃদ্ধ কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় দীননাথ আসিয়া পড়ায়, চতুর বৃদ্ধ সহসা বলিয়া উঠিলেন,—অত সকাল সকাল আজ কোথায় গিয়েছিলে, দীননাথ?

দীননাথ বলিল,—লাইব্রেরীতে। নিত্য সকালে সেখানে আমায় এক ঘণ্টা সময় দিতে হয়।

আফিসের কাযে কখন বেরুতে হয়?

দীননাথ বলিল,—সে পাট চুকে গেছে। মহীপতি বাবুর কৃপায় পাটকলের সঙ্গে আমার আর সংস্রব নেই। আমার কায তিনিই নিয়েছেন। আমিও বেঁচে গেছি।

রাজকন্যা বলিল,—উপার্জ্জনের উপায় গেল, এতো ভাবনার কথা,—বেঁচে গেলেন কি রকম?

"সে আপনি বুঝবেন না! পাটকলের কল্যাণে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকের যেমন উপকার হচ্ছে, তেমনই অপকার হচ্ছেও প্রচুর। হিসেব দেখলে বেশ বোঝা যায় যে ক্ষতির পরিমাণই বেশী।"

বৃদ্ধ বলিলেন,—সে কি? এখানে এসে অবধিই ত শুনছি, কলের কল্যাণে এ অঞ্চলে আর গরীব নেই!

দীননাথ হাসিয়া বলিলেন,—সে কথা মিথ্যে নয়। কলের

কাযে ঢুকে যারা একটু ওপর পায়, তারা বেশ দু'পয়সা উপায় করে। কিন্তু তাদের এই অস্বাভাবিক রোজগার,—গরীব সাধারণ মজুরদের মেরে। তাদেরই রক্ত এরা সব শুষে নিয়ে নবাবী করে, আর সেই দুর্ভাগা শ্রমিকরা কলের মোহে পড়ে এই ভাবে মৃত্যুর দ্বারে এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁতে তাদের আর অনুরাগ নেই, চাষে তাদের আর ভরষা নেই,—কলের চাকার পেষণে স্বাস্থ্য, শক্তি, উদ্যম সব হারিয়ে তারা আজ অকর্ম্মণ্য।

বৃদ্ধ বলিলেন,—বল কি এমন ব্যাপার এখানে ?

দীননাথ বলিতে লাগিল,—পাটকলে শুধু থলে তৈরী হয়না, চুরীর নূতন নূতন উপায়ও তৈরী হয়! কারখানার আনুসঙ্গিক মালপত্র যেমন একস্থান থেকে খরিদ হয়ে মিলের ষ্টোরে ঢুকছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনই সেই সব জিনিস বিবিধ বিধানে বেরিয়ে এসে অন্যত্র বিক্রয় হচ্ছে,—এসব চোরাই মাল কেনবার দোকানের অভাব নেই,—এই সব মালই আবার মিলে বিক্রী হয়। এমন কত বলব ? যদিও আমার সংশ্রব ছিল কণ্ট্রাক্ট দরে পাট সরবরাহ করার সঙ্গে. তবু আমার মনে হত, বিক্রীর ওপর যে মুনাফা আমার হাতে আসত আমারই দেশের সাধারণ মজুরদের রক্ত তাতে জড়িয়ে আছে। কাযেই মহীপতি বাবু দয়া করে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন দেখছি। এর জন্য তাঁকে আমি অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—বটে! কিন্তু তোমার আয়ের এত বড় একটা উপায় বন্ধ হয়ে গেল, এসব প্রতিষ্ঠান চলবে কি করে?

দীননাথ হাসিয়া বলিল,—চালাবার মালিক ত আমি নই, যাঁর কাজ তিনিই চালাবেন।

বৃদ্ধ বলিলেন,—আচ্ছা মহীপতি বাবু, তোমার বিরুদ্ধে আরও অনেক কিছু উদযোগ আয়োজন করেছেন শুন্‌তে পেলাম, তোমারও কথায় একটু আগে ও রকম কি যেন শুনেচি বলে মনে হচ্ছে। সত্যি নাকি?

দীননাথ বলিল,—আমার ওপর আদালত থেকে এক সঙ্গে অনেকগুলি নোটিস এসেছে। আমার ভদ্রাসন ব্রহ্মত্তর; এর কোন খাজনা না থাকলেও একটা রিটার্ণ ফিঃ কালেকটরীতে জমা দিতে হয়। বছর কয় থেকে স্থানীয় জমিদার সরকারেই টাকা জমা দেবার হুকুম কালেক্টরী থেকে জারী হয় আমিও সেইমত জমিদার সেরেস্তাতেই এটা দাখিল করে এসেছি। কিন্তু কোন রসিদ এর দরুণ নিই নি। এখন জমিদার নাকি আমার সম্পত্তি তাঁর জমার অধীনে বলে নালিস করেছেন।

বৃদ্ধ সবিস্ময়ে বলিল,—বল কি?

দীননাথ হাসিয়া বলিল,—শুধু কি এই একটা ব্যাপার?

প্রায় সতেরোটা পাওনাদার আমার নামে সমন পাঠিয়েছে, অথচ তাদের ষোলজনকে আমি চিনিনা বা জীবনে কখনো তাদের সঙ্গে লেনদেন করিনি।"

রাজকন্যা অবাক হইয়া এই ইতিহাস নিবিষ্ট মনে শুনিতেছিল। এইবার প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, ষোলজন ত আপনার অজানা, আর শেষের জনটি?

দীননাথ বলিল,—ইনি কলকাতার একজন বড় ব্যাঙ্কার। আমি যখন মিলে পাট সরবরাহ করতে আরম্ভ করি, ইনি আমাকে টাকা যোগাতে সম্মত হন। পাটের কাযে যা লাভ হত, তার অর্দ্ধেক তিনি নিতেন। কাজ বন্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে মিলের ম্যানেজার সমস্ত পাওনা বিলের টাকা আমাকে মিটিয়ে দেন, আমি ও তদ্দণ্ডে ঐ ব্যাঙ্কারের মূল টাকা সায় লভ্যাংশ মিটিয়ে দিয়ে আসি। কিন্তু তিনিই এখন সমস্ত টাকার দাবী দিয়ে নালিস করেছেন।

বৃদ্ধ বলিলেন,—বল কি? তা তুমি, টাকা মিটিয়ে দিয়ে রসিদ লও নি?

দীননাথ বলিল,—সাত-বছর পরস্পর পূর্ণ বিশ্বাসে কায চলে আসছে, কিন্তু রসিদের আদান-প্রদান কখনও হয়নি।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা, এই ব্যাঙ্কারটির এরূপ বিরূপ হবার হেতু কি শুনেছ?

দীননাথ বলিল,—শুনতে পাচ্ছি মহীপতি বাবু তাঁর সঙ্গেই বখরায় কায করবেন। তিনি না কি মহীপতি বাবুর আত্মীয়-স্থানীয় ও বিশেষ বন্ধু।

"ওঃ! তবেই বুঝেছি। তা হলে তোমার সমূহ বিপদ দেখছি! কি সর্ব্বনাশ!"

রাজকন্যা অবাক বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—কিরকম অদ্ভুত মানুষ আপনি বলুন ত? আপনার মাথার ওপর এই বিপদ, আর আপনি দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে আছেন? লাইব্রেরীতে গিয়ে সখের চাকরী করে এলেন? এতবড় বিপদ আপনার চারদিক দিয়ে ছুটে আসছে, অথচ আপনার মুখে ত ভয় ভাবনার চিহ্ন মাত্র নেই?

দীননাথ স্বচ্ছন্দ সহজভাবে বলিলেন,—মুখে ভয় ভাবনার ভঙ্গী অভিনেতাদের মত ফুটিয়ে তুললেই কি বিপদ সরে যাবে বলতে চান্?

রাজকন্যা বলিল,—তবে বুঝি মনের ভেতর সমস্ত ভাবনা ভয় পুষে রেখে তুষের আগুনের মত পুড়ছেন।

দীননাথ হাসিয়া বলিল,—তা হলে কি এতক্ষণ এমন স্বচ্ছন্দে আপনাদের সঙ্গে গল্প করতে পারতুম, না পরম তৃপ্তির সঙ্গে আপনারই সামনে অতগুলো নিমকি উদরসাৎ করতে সমর্থ হতুম?

বৃদ্ধ এবার গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—হাসির কথা নয়, বাবাজী, বুড়োর কথাটা তলিয়ে বোঝ,—সত্যিই হোক আর মিথ্যাই হোক, যখন তোমার শক্রপক্ষ তোমার বিরুদ্ধে দেনা দাঁড় করিয়ে নালিস করেছে, তখন তোমার ত আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা উচিত নয়।

আমাকে কি করতে বলেন ?

মহীপতিবাবুর সঙ্গে একটা রফা করলে হয় না? আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, সেই এই সব হাঙ্গামা বাঁধিয়েছে। এখন তাকে তুষ্ট করতে পারলেই সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। আমি যতদূর জেনেছি বাবাজী, তাতে মনে হয়—তুমি যদি ঐ লাইব্রেরীর উঠোনে আর একটা সভা ক'রে, বড়লোকদের বাড়িয়ে একটু স্তুতিবাদ করো, আর আগেকার প্রবন্ধের জন্য দুঃখ প্রকাশ ক'রে মহীপতি বাবুর কাছে মাপ চাও, তাহলে সব গোল চুকে যায়।"

দীননাথের হাসি মাখা মুখখানির উপর কে যেন কালি ঢালিয়া দিল! ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া তাহার পর ধীরে অথচ তেজোদৃপ্ত স্বরে সে বলিল,—দেখুন, কি জানি, কি মুহূর্ত্তে আপনাকে লাইব্রেরীতে প্রথম দেখেছিলুম! দেখেই আপনার পদতলে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করেছিলুম,—সে শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বেড়েই এসেছে,—আমার একান্ত অনুরোধ,—এ শ্রদ্ধাকে ম্লান

করে দেবেন না! আপনার মুখে ত একথা খাপ খায় না,—কি ক'রে আমাকে আপনি এই অবমাননাকর উপদেশ দিচ্ছেন! আমি গরীব অসহায় বিপদাপন্ন ব'লে আমার ব্যক্তিত্ব-আমার মনুষ্যত্ব, ত এখনও হারাই নি! তবে আপনি—

অভিমানে দীননাথের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। রাজকন্যা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। বৃদ্ধ ঈষৎ গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিলেন,—সাধ ক'রে আমি তোমাকে এতটা হীন হতে বলিনি বাবাজী! আমি শুনতে পেয়েছি, মহীপতি নাকি তার সেই আত্মীয় আর তোমার ধর্ম্মপুত্র বরদাদারকে বাধা করে মামলার সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত সম্পত্তিই ক্রোক করবার চেষ্টায় আছে। যে কোনও মুহূর্ত্তে আদালতের কুর্কি আসা আশ্চর্য্য নয়।

দীননাথ সহজভাবেই অবিচলিত স্বরে বলিল,—আমিও যে একথা না শুনেছি, তা নয়।

সবিস্ময়ে বৃদ্ধ বলিলেন,—তবু নিশ্চিন্ত হয়ে আছে?

দীননাথ পূর্ব্ববৎ সহজ সুরে বলিল,—কি করতে বলেন? চিন্তাকে ব্যাধির মত মনের মধ্যে পুষে ফল? সত্য আমার সহায়।

বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—যদি সত্যই তারা ক্রোক করতে আসে, কি করবে?

কি আর করব ? সব ছেড়ে দেব।

হঠাৎ ফটকের সম্মুখে এই সময় কতকগুলি ঢোল কঠোর রোলে বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা, হিন্দী, উর্দ্দু ভাষায় মিলিত বিশ্রী একটা হল্লা শোনা গেল।

কর্ম্মশালার কর্ম্মিগণ; গোশালা ও কৃষিশালার কৃষাণ ও গোয়ালাগণ হল্লা শুনিয়া অঙ্গনে ছুটিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে একখানি রৌপ্যখচিত সুসজ্জিত পাল্কী ফটকের মধ্য দিয়া দালানের পথে অগ্রসর হইল। পাল্কীর অগ্র-পশ্চাতে আটজন লাঠি ও সড়কীধারী ভোজপুরী বরকন্দাজ। প্রথম পাল্কীর পরেই আর একখানি পাল্কী,—তাহার পশ্চাতে আদালতের তকমাধারী ছয়জন পিয়াদা, জমিদারী কাচারীর আমলা ও পারিষদবর্গ। পাল্কী আসিয়া থামিতে না থামিতে জমিদার, বাড়ীর কয়েকজন পাইক ক্ষিপ্রতার সহিত কয়েকখানি চেয়ার আনিয়া দালানের বারান্দায় পাতিয়া দিল।

পাল্কী হইতে প্রথমে নামিল, খোদ জমীদার মহীপতিবাবু। অন্য পাল্কী হইতে নামিলেন জেলা আদালতের নাজীর মইনুদ্দিন মোল্লা। দুই জনেই ধীর পদ বিক্ষেপে বারান্দায় উঠিলেন। জমিদার মদমত্তভাবে একখানি কেদারা বসিয়া পড়িল,—নাজীর সাহেব একবার ফরাসের দিকে চাহিয়া তিনটি আঙ্গুল ললাটে ছোঁয়াইয়া একখানি কেদারা দখল করিলেন।

আমলা ও পারিষদবর্গকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যস্তভাবে দীননাথ তাহার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিল,—শীঘ্র এখানে এঁদের জন্যে একখানা লম্বা 'সপ' বিছিয়ে দাও।

ভজহরি সকলের আগে দাঁড়াইয়াছিল। সে দাঁত বাহির করিয়া রূঢ়স্বরে বলিল,—থাক্ থাক্ ভয়ে পড়ে আর ভদ্রতা দেখাতে হবে না।

দীননাথ কিছুমাত্র উত্তেজিত না হইয়া সহজ স্বরেই বলিল,—একে ভয়ে পড়ে ভদ্রতা বলেনা, এ হচ্ছে—অভ্যাগতের প্রতি গৃহস্থের কর্ত্তব্য।

দাদুর পার্শ্বে রাজকন্যা দাঁড়াইয়াছিল। সে সপ্রতিভভাবে বলিয়া উঠিল,—দীননাথ বাবু, আপনি বুঝি জানেন না,—আমাদের 'বাকড়াই' হুজুরের সামনে কুকুরের বসবার অধিকার আছে, কিন্তু চাকরের সে ক্ষমতা নেই।

রাজকবি ও রাজকন্যাকে এখানে উপস্থিত দেখিয়াই মহীপতি বাবু জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এক্ষণে রাজকন্যার এই রহস্যধ্বনিই তাহার কর্ণে যেন শূলের মত বিদ্ধ হইল। সে বক্র দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া তীক্ষ্মস্বরে বলিল,—এই যে নায়েব নন্দিনী এখানেও ধাওয়া করেছেন দেখছি!"

তাহার এই অশিষ্ট উক্তি শুনিয়া নাজির মহাশয়ও মুখখানা নত করিলেন। রাজকন্যা বলিল—শুনতে পেলুম জমিদার হুজুর

মুখের চুণকালি ঘোচাবার জন্য দীননাথ বাবুর সঙ্গে এখানে আজ ডুয়েল লড়বেন—তাই লড়াইয়ের খবরটা রাজকন্যাকে দেবার জন্যই এখানে আসা হয়েছে।

ক্রোধে এবার মহীপতি ধৈর্য্য হারাইল—তর্জ্জন করিয়া বলিল—মুখ সামলে কথা কও বলছি, বাঁদীর মুখে রাজকন্যার নাম ফের যদি শুনি—

দীননাথের তেজদৃপ্ত রূঢ়স্বরের সংঘাতে মহীপতির তীব্র তর্জ্জন ধ্বনি বাধা পাইয়া রুদ্ধ হইল। দীননাথ তখন সিংহের মত ফুলিয়া উঠিয়া মহীপতির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া আদেশের স্বরে বলিল—এই মুহূর্ত্তে এঁর কাছে ক্ষমা চাও বলছি।

এ হেন অভাবনীয় অসম্ভব ব্যাপারে মহীপতি বাবু ক্ষণিকের জন্য মুহ্যমান হইল—দীননাথের দুই দৃপ্ত চক্ষু হইতে বিস্ফুরিত অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ তাহাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিল। দীননাথ দৃঢ়স্বরে বলিল—আমার বাড়ীতে এসে আমার সম্মানীয় অতিথির উপর কটূক্তি করবার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে শুনতে চাই আমি? রহস্যচ্ছলে ইনি যা বলেছেন, আমি সত্য ভেবে তাই তোমাকে বলছি, তোমায় আমায় আজ পরীক্ষা হয়ে যাক—তুমি যখন আমাকে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী স্থির করেছ—তখন এস যদি মানুষ হও, মানুষের চামড়া গায়ে থাকে—উঠে এস, আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাক সকলের সামনে।

বলিতে বলিতে দীননাথ গায়ের খদ্দরের চাদর খানা দূরে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর সার্টের আস্তিন গুটাইয়া রণোন্মত্ত সিংহের মত ফুলিয়া দাঁড়াইল।

মহীপতি বাবু এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়া রক্তনেত্রে দীননাথের দিকে চাহিল। এতটা যে হইবে তাহা বুঝি সে কল্পনাও করে নাই। এক্ষণে সে যে কি করিবে—দীননাথের সহিত লড়িবে অথবা কি কঠিন আঘাতে তাহার বক্ষ দীর্ণ করিবে, কিম্বা তাহার বরকন্দাজদের ডাকিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া শেষে অনোন্যপায় হইয়া বলিল,—আমি তোমার মত ছোটলোক নই যে হাতাহাতি করব। ইচ্ছা করলে যাকে আমি—

বৃদ্ধ রাজকবি ঠিক এই সময় উভয়ের মধ্যস্থলে তাড়াতাড়ি আসিয়া দাড়াইলেন। বিরক্তিস্বরে মহীপতি বাবুকে বলিলেন, আর থাক মহীপতি—থাম তুমি।

বৃদ্ধের সে তেজোদৃপ্ত ঝঙ্কার মহীপতির বাক্তব্য রুদ্ধ করিয়া দিল। তাহার পর বৃদ্ধ স্নেহভারে দীননাথকে এক প্রকার টানিয়া লইয়া গিয়া ফরাসে বসাইয়া দিলেন।

নাজীর এই সব ব্যাপারে বিশেষ বিরক্ত হইয়াই বলিলেন—এ সব কি ছেলে মানুষী করছেন হুজুর, আদালতের হাকিমার হাতে থাকতে, এ সব কি করছেন?

মহীপতি গৰ্জ্জন করিয়া বলিল—এই দণ্ডে কায সেরে ফেলুন।

নাজীর তখন নথী বাহির করিয়া একবার তাহার আষ্টেপৃষ্টে চক্ষু বুলাইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—দীননাথ চট্টোপাধ্যায় প্রতিবাদী, বাদী,—কিরণচন্দ্র রায়, তিনি জিলা জজ কোর্টে প্রতিবাদির বিরুদ্ধে মায় খরচা বাইশ হাজার তিনশ বাষট্টি টাকা এগার আনা তিন পাই আদায়ের জন্য নালিস দায়ের করিয়াছেন এবং প্রতিবাদী তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বেচবার চেষ্টা করবেন জানতে পেরে অ্যাটাচমেণ্ট বিফোর জাজমেণ্ট অর্থাৎ নিষ্পত্তির পূর্ব্বেই সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আদালতের সহায়তায় ক্রোক করবার অনুমতি পেয়েছেন। এখন প্রতিবাদীকে জানান যাচ্ছে, মহামান্য জজ বহাদুরের হুকুম মত তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দেখিয়ে দিন, আমি সে সমস্ত ফিরিস্তি বন্দি করে শিল করব।

দীননাথ প্রশান্ত ভাবে বলিল,—করুন; আমার কোন আপত্তিই নাই। যখন নালিস হয়েছে স্থাবর অস্থাবর ভূসম্পত্তির ফিরিস্তি ও চৌহদ্দী আপনাদের কাছেই আছে। অস্থাবর সম্পত্তি যা যা রয়েছে তা ত দেখতেই পাচ্ছেন।

নাজীর উঠিয়া দালানের দুই পার্শ্বের ঘরে তৈজসপত্র দেখিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সব দেখতে পাচ্ছি; আর সব কি কোথায় আছে?

দীননাথ বলিল,—আমার সমস্ত ভূসম্পত্তিই এই দেনার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

নাজীর বলিলেন,—যথেষ্ট হলেও আমাকে তাবৎ সম্পত্তিই ক্রোক করতে হবে।

দীননাথ বলিল,—বাইরের ঘরের এই সব তৈজসপত্র, তাঁত শালার তাঁত ও যন্ত্রপাতি ক্রোক করুন।

ভজহরি সহসা বলিয়া উঠিল,—আর বাড়ীর ভেতরে ধানের গোলা, মালপত্র, বিছানা মাদুর, বাসন কোসন রয়েছে—সে সব অনেক টাকার জিনিষ।

দীননাথ নাজীরকে জিজ্ঞাসা করিল,—সে ও কি আপনি ক্রোক করতে চান ?

নাজীর বলিল,—সে না করলেও চলতে পারে যদি অবশ্য বাদীপক্ষ আপত্তি না করেন।

দীননাথ বলিল,—অপর কোন কারণে আমি এ অনুরোধ করছি না। বাড়ীর ভেতর হচ্ছে—অন্দরমহল। সেখানে আমাদের দেব বিগ্রহ আছেন, পাকশালায় পাক হচ্ছে—এখনও দেবতার ভোগ হয়নি। সেই জন্যই আমার এই সামান্য প্রতিবাদ।

নাজীর মহীপতি বাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুর কি কহেন ?

হুজুর তখন কি ভাবে দীননাথ-দত্ত অবমাননার প্রতিশোধ

লইবেন, তাহার সূত্র আবিষ্কার করিতে ছিলেন নাজীরের প্রশ্নে কঠোর-স্বরে উত্তর দিলেন,—সমস্ত ক্রোক করা চাই। কুলো ধুছুণীটা পর্য্যন্ত বাদ পড়বেনা, কিরণের এই ইচ্ছা। আপনি একটু তাড়াতাড়ি সব সেরে নিন। আর আগে বাড়ীর ভেতরের সব মাল পত্র শিল করে আসুন—এ সব পরে হবে।

নাজীর দীননাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—আমি কি করতে পারি বলুন, হুজুর নারাজ; চলুন ভিতরে যাওয়া যাক—

রাজকবি এবার অগ্রসর হইয়া বলিলেন—ভিতরে এখন ত যাওয়া হতে পারেনা। এখনও বিগ্রহের ভোগ হয় নি। আমরাও অভুক্ত, মহীপতি বাবু ছেলে মানুষ বা পাগল হতে পারেন; কিন্তু আপনি ত পাগল হ'ননি, নাজির সাহেব?

নাজীর কিছু রুক্ষস্বরে বলিলেন,—আমাদের এতে কোন হাত নেই। বাদীর কথা মত কায করতে আমরা বাধ্য।

বৃদ্ধ বলিলেন,—তা সত্য, কিন্তু মহীপতি বাবু ত এ মামলার বাদী নন, বাদী হচ্ছেন—কিরণচন্দ্র রায়। আপনি তাঁকে আনান—

নাজীর বলিলেন,—তাঁকে এখন কোথা পাই বলুন?

রাজকবি বলিলেন,—"জমিদার বাড়ীতেই তাঁকে পাওয়া যাবে।

মহীপতি গর্জ্জন করিয়া বলিল,—মিথ্যে কথা।

ধীর সংযত স্বরে রাজকবি বলিলেন,—সত্য কথা। আমি তাঁকে দেখেছি।

মহীপতির ধূমায়মান প্রতিহিংসা-বহ্নি এবার ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। শক্তির দিক দিয়া একটা কিছু কাণ্ড বাধাইবার জন্ত সে যে সুযোগটির প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহা স্বাভাবিক পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহীপতি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল,—ও সব বাজে কথায় কান দেবেন না নাজীর সাহেব, আপনি জোরসে অন্দরে ঢুকুন;—বরকন্দাজ!

আটজন ভোজপুরী বরকন্দাজ বারান্দার নিম্নে দাঁড়াইয়া সমস্বরে 'হুজুর' বলিয়া সেলাম জানাইল।

সঙ্গে সঙ্গে অন্দর মহলের দ্বারদেশ হইতে একজন গর্জিয়া বলিল,—কার বাবার সাধ্য আছে দেখি, অন্দরের দোরে পা বাড়ায়! দুষমনের যম গোবিন্দ মোড়ল দেউড়ী নিয়েছে,—নিশ্চিন্ত থাক তুমি দাদাবাবু! ছাতুর পিণ্ডি আজ এইখানে চটকাবোনা—

সকলেই সবিস্ময়ে দেখিলেন, দীননাথের গোশালা রক্ষক গোবিন্দ মণ্ডল খোলা গায়ে প্রকাণ্ড এক বংশ দণ্ড হস্তে অন্দরের দ্বার রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজকবি এই সময় হাঁকিলেন,—কর্ত্তার সিং কোথায় রে? সেকি গুরুগম্ভীর আওয়াজ! যেন রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে

৬

সঙ্গে ভীড়ের ভিতর হইতে চারিজন কুকরীধারী রণবেশী গুর্খা প্রহরী বারান্দার সোপানে দাঁড়াইয়া সামরিক প্রথায় বৃদ্ধকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাইল। বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—ঐ লোকটি অন্দরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, ওর দুপাশে গিয়ে দাঁড়াও —যে কেউ এদের ভেতর থেকে অন্দরে ঢুকতে যাবে, তাকে তখনই কেটে দু-টুকরো করবে।

গুর্খা চতুষ্টয় দ্বারের দিকে ছুটিল। নাজীর বলিল,—এ সব কি বে-আইনী কায করছেন মশাই?

বৃদ্ধ বলিলেন,—আমি বুড়োমানুষ, তাই আমার কথা বাজে, কায বে-আইনী; আর আপনারা হচ্ছেন—হুজুরের তরফের; সব কথাই কাযের, আর, কাযও আইন সঙ্গত! এখন আর আইনের দোহাই না দিয়ে উপায় নেই!

নাজীর হতাশ হইয়া বলিলেন,—তা হলে আপনি কি করতে বলেন?

বৃদ্ধ সহজ ভাবেই বলিলেন,—আগেইত বলেছি। আবার বলছি—কিরণ রায়কে আনান।

নাজীর বিরক্তভাবে বলিলেন,—তাতে কি হবে মশাই?

বৃদ্ধ বলিলেন,—সমস্ত হাঙ্গামা মিটে যাবে, আমরা তাঁর সঙ্গে এখনই মীমাংসা করে ফেলব; তিনি আমাকে বড়ই দয়ার চোখে দেখেন। আর আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আপনাকে—যদি

তিনি এসেও না মিটাতে চান, তখন আপনি অন্দর মহলে মাল ক্রোক করতে ঢুকবেন, আমরা কোন বাধা দেব না।

তখন নাজীর ও জমিদারের মধ্যে কিছুক্ষণ পরামর্শ হইল। মহীপতি একখানা চিরকুটে কয়েক ছত্র কি লিখিয়া এক আমলার হাতে দিল। তাহার পর বেহারারা জমিদারের হুকুমে পাল্কী লইয়া ছুটিল। মহীপতি বাবু বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কিরণ বাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় কোথায় হয়েছিল?

বৃদ্ধ বলিলেন,—দেবীপুরে। যে ফারমে কিরণ বাবু আছেন, তার বারো আনা মালিক হচ্ছেন দেবীপুরের রাজা,—কিরণ বাবু তার ওয়ার্কিং পার্টনার।

ভজহরি বলিল,—তাই বুঝি কিরণ বাবুর কাযে বাধা দিতে রাজবাড়ীর গুর্খাদের লিলিয়ে দিয়েছেন। দিব্বি হিতৈষী আপনি!

মহীপতি বাবু বলিল,—রাজবাড়ীর গুর্খাদের ওপর হুকুম চালাবার আপনি কে?

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন,—আমি যতক্ষণ আছি, আমার হুকুম মতই কায হবে। রাজারও এই রকম হুকুম।

এই সময় ভীড় ঠেলিয়া ইউল মিলের ইংরেজ ম্যানেজারকে বারান্দায় উঠিতে দেখিয়া মহীপতি ও দীননাথ উভয়েই চমৎকৃত হইল।

দীননাথ করমর্দ্দন করিয়া তাঁহাকে সমাদরে একখানা চেয়ারে বসাইল। ম্যানেজার সবিস্ময়ে পারিপার্শ্বিক জটিল অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্যাপার কি ?

দীননাথ ব্যাপারটি সংক্ষেপে বুঝাইয়া বলিল। ম্যানেজার একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মহীপতিবাবুর দিকে চাহিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন,—এই যে স্যার! আপনিও যে ?

মহীপতি জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি এখানে কি মনে করে মিষ্টার হুইলার ?

হুইলার বলিলেন,—আমি আশ্চর্য্য ভাবে এখানে এসে পড়েছি। এই দীননাথ বাবুর বাড়ীতে এই সময় দেবীপুরের রাজাবাহাদুর আমার সঙ্গে এনগেজমেণ্ট করেছেন।

দীননাথ সবিস্ময়ে বলিল,—রাজা বাহাদুর এনগেজমেণ্ট করেছেন আমার বাড়ীতে ? আপনি কি বলছেন মিষ্টার হুইলার ?

হুইলার স্থির স্বরে বলিলেন,—আমি প্রকৃত কথাই বলছি দীননাথ বাবু।

মহীপতি বাবু বিদ্রূপের সুরে বলিল,—রাজা বাহাদুর তোমার সঙ্গে আর এনগেজমেণ্ট করবার স্থান খুঁজে পান নি দেখছি!

হুইলার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—রাজা তাঁর মনোগ্রাম করা চিঠির কাগজে নিজে আমাকে পত্র লিখেছেন। দুঃখের

বিষয় সে পত্র আমি অফিসে ফেলে এসেছি। আমাকে এভাবে হায়রাণ করে রাজার লাভ?

মহীপতি জিজ্ঞাসা করিল,—রাজা কোথায় এখন জানেন?

বৃদ্ধ বলিলেন,—রাজা যেখানেই থাকুন না তাতে কি আসে যায়! ঐ ত রাজার এক পার্টনার আসছেন পাল্কী চেপে,—রাজার আসাও বিচিত্র নয়।

বেহারাদের হুঙ্কার শোনা গেল। দেখিতে দেখিতে পাল্কী দালানের সম্মুখে আসিয়া থামিল। সৌখিন পরিচ্ছদ পরিহিত, সুন্দর চেহারা, সোনার চশমা-পরা এক প্রৌঢ় ব্যক্তি পাল্কী হইতে নামিয়া সোপান বাহিয়া বারান্দায় উঠিতে লাগিলেন। ইনিই কুমার কিরণপদ রায়। বিখ্যাত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রায় কোম্পানীর ওয়ার্কিং পার্টনার্ এবং জেনারল্ ম্যানেজার।

এই অতি আকাঙ্ক্ষিত মানুষটির দিকে প্রত্যেকেরই চক্ষু পড়িবার কথা এবং যদি সকল চক্ষুর দৃষ্টি সমান কৌতূহলোদ্দীপক না হয়, তাহাও বিস্ময়ের বিষয় নয়। কিন্তু তাহার পানে দীননাথের না চাওয়াটাই এক্ষেত্রে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। এই লোকটাকে উপরে উঠিতে দেখিয়াই সে মুখখানা অতিশয় গম্ভীর করিয়া অন্যদিকে ফিরাইয়া বসিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা গেল যে, ইহার সহিত সহসা চোখোচোখী হয়, ইহাও যেন সে চাহে না।

কিন্তু কিরণপদ রায় আমিরী কায়দায় তাঁহার পরিপুষ্ট দেহখানা তুলাইয়া দালানে উঠিবামাত্রই সহসা বিদ্যুৎপৃষ্টবৎ আড়ষ্ট হইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী তরুণীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই এই অবস্থা তাঁহার হইল। কিন্তু ইহা কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই নিজেকে সুকৌশলে সামলাইয়া লইয়া এবং শবের মত বিবর্ণ মুখখানা হাস্যোজ্জ্বল করিয়া কৃত্রিম উল্লাসের সুরে তিনি কহিলেন,—কর্ত্তা-রাজা ? কল্যাণী ?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক রকম ছুটিয়া বৃদ্ধের পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন, উভয় পদতলে উভয় করতল ঘন ঘন সঞ্চালিত করিয়া ধুলি আহরণের কি বিপুল প্রয়াস তাঁহার !

বৃদ্ধ নিজের পা দুইখানি সরাইয়া ও পদতল হইতে কিরণপদকে দুইহাতে কিঞ্চিৎ দূরে ঠেলিয়া দিয়া সহজ কণ্ঠেই কহিলেন,—এজন্য তোমাকে ডাকা হয়নি কিরণ, ডাকবার কারণ তুমি যে না বুঝেছ তা নয়।

কিরণপদ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উত্তর দিলেন,—এই নোংরা জায়গায় আপনাদের এই ভাবে দেখে আর মহীপতি বাবুর লেখা চিরকুট পড়ে বুঝতে পারছি আমি, এখনও সবাই অন্ধকারে আছেন ; কেউ জানতে পারেনি, এখানে কিরকম একটা অসম্ভব সম্ভব হয়েছে !

বৃদ্ধ যেন কিরণপদর কথাগুলি চাপা দিবার অভিপ্রায়েই

তাড়াতাড়ি কহিলেন,—কিন্তু তার চেয়েও অসম্ভব কাণ্ড এখানে বাধিয়ে বসেছ তুমি! যাক্, এখন আমি তোমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করছি, একটি একটি করে তার উত্তর দাও।

কিরণপদ হাসিমুখে কহিলেন,—কিন্তু তার আগে যদি আমি এঁদের সকলকে জানিয়ে দিই যে, দেবীপুরের মহামান্ত রাজা বাহাদুর নিজেই এখানে তাঁর নাতনীর সঙ্গে উপস্থিত, সেটা কি দোষের হবে?

কিরণপদ বাবুর আবির্ভাব, বৃদ্ধ ও তরুণীকে দেখিবা মাত্র বিস্ময়ভাব ও তাঁহার ব্যবহার, অনেকেরই চিত্তে এইরূপ একটা সংশয়ের দোলা দিতেছিল, এখন যে কথাগুলি তিনি কহিলেন তাহাতে একটা বিস্ময়াবহ আবরণ যেন ধীরে ধীরে তাঁহাদের চক্ষুর উপর হইতে সরিয়া গেল। কি আশ্চর্য্য! এই সৌম্য চেহারা অতি সাদাসিধা কাপড়-চোপড়-পরা, সাধারণ বৃদ্ধটি দেবীপুরের অসাধারণ মনীষী স্বনামধন্ত রাজা শক্তিপদ রায়! আকস্মিক উন্মাদনায় ও রাজার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায় আর সকলেই সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিল, শুধু মহীপতি বাবু একাই তাঁহার কেদারায় বসিয়া আড়নয়নে নিজের মর্য্যাদাটুকু বজায় রাখিয়া রাজার দিকে ঘন ঘন তাকাইতেছিল।

মিষ্টার হুইলার তাঁহার মাতৃভাষায় একটা সুপরিচিত উল্লাস-ধ্বনির সহিত মাথার টুপি খুলিয়া রাজা বাহাদুরকে অভিবাদন

করিলেন। রাজা সাদরে তাঁহার করমর্দ্দন করিয়া পুনরায় চেয়ারে বসাইয়া শিষ্টাচারের পরিচয় দিলেন।

মহীপতি একাই ফাঁফরে পড়িয়াছিল। সে স্থির করিতে পারিতেছিল না, এ ক্ষেত্রে কি করিবে! যে কাণ্ড বাধাইয়া বসিয়াছে, কেমন করিয়া তাহার গতি ফিরাইবে? গোড়া হইতেই যাহাকে অবহেলার দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, অনুগ্রহ-ভাজনদের অন্তর্ভুক্ত জানিয়া কোন মর্য্যাদা দেয় নাই, এখন কেমন করিয়া সে ভুল সংশোধন করিয়া লইবে? অথচ, চুপ করিয়া বসিয়া থাকাও ত চলে না। সুতরাং মুখের গাম্ভীর্য্যটুকু সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া ও কণ্ঠের স্বরে শ্লেষ ভরিয়া সে সহসা কহিয়া উঠিল,—এখন ভাবছি, যদি জ্যোতিষটা জানা থাকতো!

রাজা বাহাদুর হাসিমুখে উত্তর দিলেন,—তাতে বিশেষ ফল কিছু হ'ত না; হিন্দিতে একটা কথা আছে—চিরাগ্ কা নীচু আঁধেরা।

মিষ্টার হুইলার হাসিয়া কহিলেন,—ডার্ক[illegible] আণ্ডার দি ল্যাম্প।

মহীপতি মুখখানা কিঞ্চিৎ কঠিন করিয়া কহিল,—কথাটা আমি এই ভাবে বলছি যে, প্রথম যেদিন রাজা বাহাদুর দয়া ক'রে দেখা দেন, যদি এ পরিচয় জানা থাকতো—

বক্তাকে কথাটা শেষ করিবার সুযোগ না দিয়া রাজা বাহাদুর নিজেই এই বলিয়া উপসংহার করিলেন,—তাহলে দুই পক্ষের অনেক কথাই অপরিচিত থেকে গোলযোগ বাধতো।

নাজীর এই সময় অসহিষ্ণুভাবে কহিলেন,—আমাকে এবার আপনারা অনুগ্রহ করে ছুটি দিন। ব্যাপার যে ভাবে পড়িয়েছে তাতে বুঝতে পারছি, এর গোড়াতে মস্ত গলদ; পয়সা আর পসারের জোরে আইনের ফাঁক দিয়ে একটা বে-আইনের সামিয়ানা বানানো হয়েছে, কিন্তু ধোপে টেঁকবে না। এখন রাজা বাহাদুরই এই য়্যাটাচ্‌মেণ্ট সম্বন্ধে একটা কিনারা করে দিন, যাতে আমাকে না ফ্যাঁসাদে পড়তে হয়। ফয়সালা এর যা হবার কোর্টেই হবে।

এতক্ষণ দীননাথ আর সকলের লক্ষ্যের বাহিরেই পড়িয়াছিল। কিন্তু রাজা বাহাদুর বক্রদৃষ্টিতে এই বিপন্ন তরুণ গৃহীর মুখের দিকে চাহিতেই আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এত বড় হাঙ্গামা এবং সর্ব্বপ্রকারে অপদস্থ ও সর্ব্বহারা হইবার সম্ভাবনা, যে যুবার মুখে দুর্ভাবনার একটি দাগও টানিতে পারে নাই, তাঁহার এই অপ্রত্যাশিত পরিচয় সেই সাহসদীপ্ত মুখখানাকে যেন আশ্চর্য্য রকমেই বদলাইয়া দিয়াছে; পক্ষপাতী ব্যক্তির এইরূপ প্রকাশে যেখানে প্রচুর আশা উৎসাহ বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার করিবার কথা, এইরূপ পরিবর্ত্তনে

তাহার কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই। বরং পরিচয় পাইবামাত্রই মুখখানা ভার করিয়া নিজের স্থানটি হইতে আস্তে আস্তে উঠিয়া সে বাহিরের দিকেই তাহার উদাস দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল, কতূহলী জনতা যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার অদৃষ্ট-নাট্যের এই বিস্ময়াবহ যবনিকাটির দিকে ব্যগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল।

ঠিক এই সময় কল্যাণীর দৃষ্টিও ওদিকে পড়ে এবং দাদা মহাশয়ের সহিত চোখোচোখী হইতেই উভয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে যে অর্থপূর্ণ হাসির ক্ষীণ রেখাটি ফুটিয়া উঠে, আর কেহ তাহা লক্ষ্য না করিলেও কিরণপদর দৃষ্টি এড়ায় নাই।

নাজীরের কথার উত্তরে রাজা বাহাদুর কি বলেন তাহা শুনিতে সকলেই যখন উৎকর্ণ, সেই সময় দীননাথ সহসা মুখ ফিরাইয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—দেখুন নাজীর সাহেব, অনুগ্রহ আমি কখনও কারুর কাছে দাবী করিনি, এ ক্ষেত্রেও করব না। আমি শুধু অনুরোধ করেছিলুম, ভেতর বাড়ীতে পরোয়ানা নিয়ে যাতে হানা দেওয়া না হয়। তার কারণও জানিয়েছি। তবুও বলছি, বাদীপক্ষের আপত্তি যদি থাকে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, যে জন্য আমার আপত্তি সেটুকু আমি শেষ করে আপনাকে ছুটি দিচ্ছি।

নিজের কথাটার সমর্থনের প্রতীক্ষা না করিয়াই অতঃপর সে রাজা বাহাদুরের দিকে চাহিয়া অনুমতি গ্রহণের ভঙ্গীতে সহজ

ভাবেই কহিল,—আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহলে গৃহ-দেবতার ভোগের ব্যবস্থা করে আপনাদেরও ওপাঠটা চুকিয়ে ফেলি।

কিন্তু রাজা বাহাদুর তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখখানা একটু কঠিন করিয়া কহিলেন,—তা কি হয়, আমার আবার এমনি বদ অভ্যাস, পেছনে কোনো ঝঞ্ঝাট থাকলে, হাতখানা মুখের দিকে কিছুতেই উঠতে চায় না। বেশ ত, এ গোলমালটা আগেই মিটিয়ে ফেলা যাক্ না।

শেষের কথাটার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উভয় চক্ষুর দৃষ্টিটা প্রখর হইয়া কিরণপদর মুখের উপর পড়িল। এ দৃষ্টির সহিত সম্ভবতঃ কিরণপদ পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনিও মনে মনে যুক্তি স্থির করিয়া ইতিমধ্যেই শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

রাজা বাহাদুর প্রশ্ন করিলেন,—দীননাথের নামে মামলা দায়ের করেই এই অগ্রিম কুর্কির ব্যবস্থা তুমিই করেছ ?

দৃঢ়স্বরে কিরণপদ উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ।

রায় কোম্পানীর সংস্রবেই এই মামলা ?

নিশ্চয়ই।

টাকা তুমি বুঝে পাওনি ?

টাকা ?

কারবার বন্ধ হতেই দীননাথ বাবু কোম্পানীর পাওনা টাকাটা মিটিয়ে দেন নি ?

এই কথাই বুঝি ইনি আপনাকে শুনিয়েছেন আর সেই জন্যই আমাকে এখানে ডাকিয়ে আনা হয়েছে ?

আমি যে কথা জিজ্ঞাসা করেছি তারই উত্তর চাই।

তার উত্তর এই, টাকাটা উনি অবশ্যই ওঁর ঘর থেকে বার করেছেন, কিন্তু আমাদের ঘরে ঢোকেনি।

তবু তুমি সোজা কথা বলবে না ?

সোজা কথা বলতে হলে এর ভেতর অনেক বাঁকা কথা এসে পড়বে ; সকলের সামনে, বিশেষতঃ, মা-কল্যাণী যখন রয়েছেন, বলা উচিত হবে না এবং বলতেও বাধে।

কিরণপদর রহস্যময় কথাগুলি শ্রোতৃবৃন্দকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। প্রতি মুহূর্তেই দীননাথের মুখে প্রতিবাদের আগ্রহ স্পষ্টতর হইলেও প্রকাশ হইবার উপযুক্ত অবসর পাইতেছিল না। ঠিক এই সময় উত্তর দিবার জন্য সে উন্মুখ হইতেই কল্যাণী যেন সহসা তাহাতে বাধা দিয়া তাহার আগেই দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল,—এখানে বাধা-বাধি কিছু নেই রাঙ্গা-কাকা, আপনি বলুন।

দীননাথ কতকটা আশ্বস্ত হইল, তাহার মনের ভিতরেও এই কথা উদগ্র হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, এই তরুণী কিরণপদকে রাঙ্গা-কাকা বলিয়া সম্বোধন করিল কেন ? তবে কি ইহাদের মধ্যে বংশগত কোনো সম্বন্ধ

রহিয়াছে ? এখানে আসিয়া বৃদ্ধকে দেখিবা মাত্র এই কিরণপদ সবিস্ময়ে যে সম্বোধন করিয়াছিল, তাহাও দীননাথের স্মৃতি পথে সংশয় তুলিতেছিল। নিজের অজ্ঞাতে অবাঞ্ছিত অভিজাত সমাজের সহিত এই যোগ সূত্রের বন্ধন যেন অবিচ্ছিন্ন ভাবে তাহাকেও জড়াইতেছিল। ইহা সহসা ছিন্ন করিবার উপায় অন্বেষণে যখন সে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় কিরণপদর অতি কঠোর কথাগুলি বন্দুকের গুলীর মতই বুঝি তাহার বুকে বিঁধিল।

কিরণপদ কহিতেছিলেন,—টাকাটা রোখ্ করে মিটিয়ে দেবার জন্য দীননাথ সোনাগাছির কৃষ্ণা বাঈজীর বাড়ীতে গিয়েছিল, একথা সত্যি।

এই অপ্রিয় কথাটি প্রায় সকলকেই চমকিত করিয়া দিল। কল্যাণী মুখখানি রাঙা করিয়া তাহার রাজা-কাকার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিল। দীননাথ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কে যেন তাহাকে মুহূর্ত্ত মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া দিয়াছে। রাজা বাহাদুরও নির্ব্বাক, কিন্তু একটু পরেই সে ভাব কাটাইয়া তিনি কিছুক্ষণ কিরণপদর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে প্রশ্ন করিলেন,—তোমার পাওনা মেটাবার সঙ্গে ও কথাটার কি সম্বন্ধ, তা ত বুঝতে পারলুম না।

কিরণপদ মুখখানা একটু নত করিয়া কহিলেন,—বুঝতে পারবেন না আপনি কর্ত্তা-রাজা, সে হচ্ছে স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার,

অজানা অতিথি

আমাদের আফিসের কোনো লোকের সঙ্গে কৃষ্ণা বাঈজীকে উপলক্ষ ক'রে দীননাথের রেষারেষি চলছিল। সে লোক ওঁকে খাটো করতে বাঈজীর সামনেই বলে, 'উনি দেনাদার, রায় কোম্পানীর টাকাতেই ওঁর কারবার, আর যতকিছু লপর-চপর।' এতেই দীননাথ বাবু বেজায় চটে যান, তাকে জানান, 'টাকাটা অনুগ্রহ করেই উনি খাটাচ্ছেন। কালই সেইখানে তার নাকের ওপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেবেন।' আপনি শুনে অবাক হবেন যে, বাঈজীর কাছে মান বাড়াতে পরদিনই দীননাথ সেই কাণ্ড বাধায়, অর্থাৎ এক তাড়া নোট দলা পাকিয়ে ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে ফেলে দেয়। সে ক্ষেত্রে তার ফল যা হবার তাই হয়েছিল। বাঈজী হাসতে হাসতে সেগুলো গুছিয়ে তার সিন্দুকে তুলেছিল।

রাজা বাহাদুর ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি ভাবিলেন, তাহার পর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—তোমাদের সেই লোকটি কে, দীননাথ বাবু যার নাকের উপর নোটগুলো ছুঁড়েছিল?

কিরণপদ রায় কহিলেন,—আমাদের কোম্পানীর আদায় বিভাগের কর্ম্মচারী, নাম তাঁর দুনীচাঁদ গুপ্ত।

রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঐ লোকটার সঙ্গেই বুঝি বাঈজীকে নিয়ে দীননাথের রেষারেষি চলছিল?

কিরণপদ উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ।

রাজা বাহাদুর প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে কহিলেন,—তাহলে তার ঐ গল্পটা খুবই বিশ্বাসযোগ্য বই কি!

কিরণপদ সপ্রতিভ কণ্ঠে কহিলেন,—তার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নিশ্চয়ই হত না—যদি সে ঐ টাকাটা বাঈজীর খপ্পর থেকে উদ্ধার করবার প্রতিশ্রুতি না দিত।

রাজা বাহাদুর এবার গম্ভীর মুখে কহিলেন,—তুমি রহস্যের জালটা ক্রমশঃই ঘন করে বুনে চলেছ কিরণ!

কিরণপদ কহিলেন,—অনুগ্রহ করে আমার কথাটা আগে শুনুন, তাহলেই সমস্ত সোজা হয়ে দাঁড়াবে। দীননাথকে আমি যেমন ভালবাসি, তেমনি ওর চরিত্রগত ত্রুটিতে দুঃখিতও হয়েছি। সঙ্গদোষে কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরে গেছে। গুপ্তর কাছে কথাটা শুনেই আমি নিজে কৃষ্ণা বাঈজীর বাড়ীতে যাই, কথাটা তুলে তাকে ভয় দেখাই। তাতে সে বলে, 'দীন বাবু তাকে একখানা বাড়ী করে দেবে বলেছিল, টাকাটা সেই বাবদেই সে নিয়েছে।' শেষে পুলিসের ভয় দেখাতে সে বললে, 'দীন বাবুকে আনবেন, তার হাতেই টাকাটা দেব।' কথাটা দীননাথকে জানিয়ে মীমাংসার জন্য ডাকি। সে ও আসে। কিন্তু সে সময় আমাদের আফিসে মহীপতি বাবু আর ভজহরিকে দেখে ও যে রকম ব্যবহার করলে, রীতিমত একটা গলদ থাকা সত্ত্বেও কোনো বুদ্ধিমান লোক তা করে না। ও শুধু আমাকে অপমানিত করে নি, মহীপতি বাবু সেখানে

অভ্যাগত জেনেও তাঁকে আক্রমণ করেছে এবং আমাদের এত বড় প্রতিষ্ঠানটির ওপরও রীতিমত আঘাত দিয়েছে। আমাদের প্রেষ্টিজ রক্ষা করতে আর ওকে রীতিমত শিক্ষা দিতেই অতিবড় নিষ্ঠুরের মত অগত্যা এ কাযে আমাকে হাত দিতে হয়েছে।

রাজা বাহাদুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—এ ব্যাপারে মহীপতি বাবুর প্রভাব কি ভাবে পড়েছে ?

কিরণপদ কহিলেন,—সেটা কাকতালীয়বৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর সামনেই ঘটনাটা হতে তখনই আমাদের ভেতর একটা প্রাইভেট 'প্যাক্ট' হয়ে যায়। তাতেই এ ব্যাপারে মহীপতি বাবুর মত বিশিষ্ট লোককেও সরেজমিনে আসতে হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, আইনের নাগ পাশে ওকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে দাবিয়ে রাখা।

দীননাথ এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাক বিস্ময়েই তাহার সম্বন্ধে এই সব আলোচনা শুনিতেছিল। যদিও স্বভাবতঃই সে হঠকারী, কিন্তু আজ চিত্তগত কোনোরূপ উত্তেজনাকেই সে প্রশ্রয় দেয় নাই, তাহার প্রশস্ত ললাটের একটি শিরাও স্ফীত হইয়া উঠে নাই। কিরণপদর হাতের নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক তীরটি বুঝি তাহার এক একটি সবল মনোবৃত্তির উপর পড়িয়া তাহাদের চেতনাশক্তি অসাড় করিয়া দিয়াছে। এই অবস্থায় আত্মপক্ষ সমর্থনে কি

তাহার বলিবার আছে এবং তাহার প্রতিপক্ষদের সুচিন্তিত উক্তি খণ্ডন করিবার মত অস্ত্রই বা তাহার কোথায় ? এই অবস্থাতেও সে অতি সন্তর্পণে চাহিয়া দেখিল, তাহার প্রতি নিবিড় সহানুভূতিশীল বৃদ্ধ ও তরুণীর মুখে সে প্রসন্নতা আর নাই, সন্দেহের একটা সুস্পষ্ট ছায়া যেন তাহাদের উপর আবরণ ফেলিয়াছে। মানুষের মনের এই দৌর্ব্বল্য ও তাসের প্রাসাদের মত তাহার ভঙ্গুর অবস্থা ভাবিয়া সে মনে মনেই হাসিল।

এই সময় রাজা বাহাদুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—দীননাথ বাবু, কিরণপদকে তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করবে ?

হঠাৎ তন্দ্রা ভাঙ্গিলে যে অবস্থা হয়, যে ভাবে নিদ্রাতুর চমকাইয়া উঠে, ঠিক সেই অবস্থাই দীননাথের হইল। কথাটার উত্তর না দিয়া দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নিজেই প্রশ্ন করিল,—আমাকে বলছেন ?

রাজা বাহাদুর কহিলেন,—হ্যাঁ, এবার তোমারই বলবার পালা।

দীননাথ অস্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল,—কিন্তু এর পর আর বলা কিছু চলে না।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন ?

দীননাথ কহিল,—কথার সুর উনি শেষ পরদায় চড়িয়েছেন, এখন আর মুখের কিছু কায নেই।

বিস্ময়ের স্বরে রাজা বাহাদুর কহিলেন,—এ কথার মানে ?

দৃঢ় স্বরেই দীননাথ কথাটার জবাব দিল,—এর মানে খুলে বলতে হলে এই কথাই বলতে হয়, মুখের কায উনি খতম করে ছেড়েছেন ; এখন এক মাত্র উপায় হচ্ছে, রিভলভার হাতে করে দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এর চরম নিষ্পত্তি করে ফেলা।

রাজা বাহাদুর গম্ভীর মুখে কহিলেন,—কিন্তু সেটা আইনে বাধে, তা ছাড়া এটা সে দেশও নয়, আর আমরা সে জাতও নই।

কিরণপদর মুখে বিদ্রূপের হাসি তীক্ষ্ণ হইয়া ফুটিল ; তিনি আপন মনেই আওড়াইলেন,—Fools rush in, where angels fear to trade.

রাজা বাহাদুর একটু বিচলিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন,—তুমি কি তাহলে ঐ কথাগুলোর প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক নও, মেনেই নিতে চাও ?

কণ্ঠস্বর এবার সহজ ও স্বাভাবিক [illegible]য়া দীননাথ উত্তর দিল,—আমার কথা আগেই শেষ কর[illegible] এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা সম্ভব হবে না।

কল্যাণী এতক্ষণ আড়ষ্টভাবে বসিয়া সকলের কথা শুনিতেছিল। দীননাথের শেষের কথা কয়টি যেন তাহার পৃষ্ঠে চাবুকের আঘাত

ছিল, সহসা সোজা হইয়া বসিয়া সে কহিল,—আপনার ও কথার কোনো মানে হয় না, ওকে বলে—আত্মহত্যা। এর পর কিছু বলা আপনার পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, আপনার সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধ রাখা আমাদের পক্ষেও সম্ভব না হতে পারে।

দীননাথ এ কথায় কিছু মাত্র অপ্রতিভ না হইয়া শ্লেষের সুরে কহিয়া উঠিল,—এই যে, আপনিও মুখোস খুলেছেন দেখছি; আমিও এই রকম একটা কিছুই প্রত্যাশা করছিলুম।

রাজা বাহাদুর প্রতিবাদের ভঙ্গীতে কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—ও কথাটা এ সময় না বললেই পারতে দিদি, ওটা ঠিক হয় নি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে কল্যাণী কহিল,—নয় কেন শুনি? এখানে এসে আমরা ওঁর একটা দিকই দেখেছি, আর একটা দিক যা লুকানো ছিল, তাতে আচ্ছা করে কালি লেপে আমাদের চোখের ওপর তুলে দেখালেন রাজা কাকা; ওঁর উচিত নয়, সে কালি নিজের হাত দিয়ে রগড়ে তুলে ফেলা?

রাজা বাহাদুর হাসি মুখে উত্তর দিলেন,—যে মামলায় আসামীর তরফ থেকে সওয়াল-জবাব চলে, জজের কায সেখানে হাল্কা হয়ে যায়; কিন্তু যেখান থেকে জবাব আসে না, প্রতিবাদ ওঠে না, সেই খানেই জজকে ভাবিয়ে দেয়। দীননাথকে নিয়ে আমাদের অবস্থাও দাঁড়াচ্ছে তাই। নালিশ শুনেই এক তরফা

ডিগ্রি ওর ওপর চাপানো কি সঙ্গত হবে? সামনেই ত আদালতের হুমকীর এক তরফা নজীর দেখতে পাচ্ছ দিদি!

কল্যাণী মুখখানা ভার করিয়া কহিল,—তাতে কি ওঁর মুখখানা উজ্জল হচ্ছে! সর্ব্বস্ব ধরেই ত টানাটানি চলেছে—

রাজা বাহাদুর কহিলেন,—বোঝো, এতেও ওর ভ্রুক্ষেপ নেই! আমার মনে হয়, যথাসর্ব্বস্ব যদি ওর যায়, তবুও পাল্টা নালিশ করতে আদালত-ঘর ও কিছুতেই করবে না। সব দিক দিয়ে ভেবে তোমার ও কথাটা ফিরিয়ে নেওয়া উচিত! বিশেষতঃ, আমরা যখন এখানেই আজ অন্নগ্রহণের অঙ্গীকার করেছি।

কথাটা শুনিয়া মহীপতি যে পরিমাণে চমকিত হইয়াছিল, ততোধিক বিচলিত হইলেন কিরণপদ রায়!—দেবীপুরের রাজ-পরিবার এই অতি সাধারণ মানুষটির গৃহে অন্নগ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন! কি আশ্চর্য্য!

মুখখানা কঠিন করিয়া কল্যাণী কহিল,—সেই জন্যই ওঁর উচিত, আগেই জানিয়ে দেওয়া যে ওঁর মুখে কালির দাগ নেই।

রাজা বাহাদুর ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—তাহলে আমাকেও একথা বলতে হয় দিদি, ওঁর দুটো দিকই আগে দেখে তার পরে ওঁকে অঙ্গীকার করে নেওয়া আমাদেরই ছিল উচিত।

ঠিক এই সময় এক বৃদ্ধ অন্দরের দরজার দিক হইতে আস্তে আস্তে দালানটির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকষ কালো

চেহারা, গায়ে কোনো আবরণ নাই, পরণে এক খানা আধময়লা ধুতি, মাথার চুলগুলি এলোমেলো, বয়স পঞ্চাশের সীমা অতিক্রম করিলেও দেহের কোথাও বার্দ্ধক্যের ছায়া এখনও পড়ে নাই। এই লোকটিকেই ইতিপূর্ব্বে আমরা হুঙ্কার তুলিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে পাহাড়ের মত দাঁড়াইতে দেখিয়াছি। এই লোকই দীননাথের পরিজন স্থানীয় অনুচর গোবিন্দ মোড়ল।

এ ভাবে তাহাকে দালানের নীচেই দাঁড়াইতে দেখিয়া সকলের দৃষ্টি তাহার দিকে আকৃষ্ট হইল। গোবিন্দ সেই স্থান হইতেই রাজা বাহাদুরকে উদ্দেশ করিয়া করযোড়ে কহিল,—গরীবের একটা কথা অবধান করতে আজ্ঞে হোক হুজুর!

পূর্ব্বাহ্নেই এই লোকটির সহিত রাজা বাহাদুর ও তাঁহার নাতনীর পরিচয় হইয়াছিল। দীননাথের বাল্যজীবনের সকল কথাই গোবিন্দ অকপটে ইহাঁদিগকে শুনাইয়া দিয়াছিল। এই মাতৃহারা শিশুটিকে কিভাবে সে কোলে-পীঠে তুলিয়া মানুষ করে, প্রথম যৌবনে পিতৃবিয়োগের ব্যথা কেমন করিয়া সে মুছিয়া দেয়, পড়াশুনার দিকে কোনো বাধা যাহাতে না পড়ে, সে সম্বন্ধে কি কাণ্ডই সে করিয়াছে এবং তাহার দাদাবাবু আজ দেশের দশ জনের একজন হইয়া কিভাবে তাহার মুখখানা উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছে, একটি একটি করিয়া সে সমস্ত কথাই ইহারা জানিয়া লইয়াছেন। দীননাথের প্রকৃতিগত ত্রুটিগুলিও গোবিন্দ ইহাদের

নিকট ঢাকিয়া রাখে নাই, ব্যক্ত করিয়া সদুপায় চাহিয়াছে। যেমন দেদার উপায় করে, তেমনিই তার বেয়াড়া খরচ, কোনো হিসেব নিকেশ নেই। যারা এখানে কায করবে, তারাই দুবেলা খাবে, এই বাবুর ব্যবস্থা; অথচ, মাস কাবার হলেই মাইনের সময় 'ওপরটাইমে'র হিসেবটি পর্য্যন্ত পাই-পয়সা বুঝে নিতে কেউ ছাড়ে না। বাবুকে বলতে গেলে আর রক্ষে নেই, রাগ করে হয়ত খাওয়া-দাওয়াই ছেড়ে দেবেন। কত রকমের লোক এসে যে পয়সা ঠকিয়ে নিয়ে যায়, সে আর কহতব্য নয়। এমনই কত অভিযোগই সে করিয়াছে এবং একান্ত অনুরোধও জানাইয়াছে, দাদাবাবু যাহাতে একটু শক্ত হন, আখেরের ভাবনা ভাবেন এবং একটি ডাগর ডোগর মেয়েকে বিবাহ করিয়া সংসারটা বজায় রাখেন—সেই ব্যবস্থাই যেন ইঁহারা করিয়া দেন। দীননাথের প্রকৃতিগত এই ত্রুটিগুলি ব্যতীত চরিত্রগত কোনো ত্রুটির কথাই গোবিন্দর মুখ দিয়া বাহির হয় নাই।

গোবিন্দের দিকে চাহিয়া প্রসন্নমুখেই রাজা বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বলতে চাও, গোবিন্দ ?

গোবিন্দ সাহস পাইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিল,—মুখ্যু মানুষ, ল্যাকা-পড়া জানিনা, তাহলেও কথা পড়লে বুঝতে পারি; তার জবাবও ভগবান যুগেয়ে দেন এই জিহ্ব্‌টায়। আমাদের দাদাবাবুর কথাই কইছি, হুজুর! লোকে যে যাই বলুক, আমি

তাতে খোড়াই কেয়ার করি। দাদাবাবু আমাদের গঙ্গাজল। মা-গঙ্গার বুকে কত রকমের লোকে কত ময়লাই ত ফেলে, কিন্তু জলের মাহাত্ম্য কি তাতে যায় হুজুর, না মা-গঙ্গা মুখ তুলে তার জন্যে নালিস তোলেন ? আমাদের দাদাবাবুও তাই, ওঁর দেহটা হচ্ছে বারাণসী, আর মনটা একেবারে ভাগিরথী।

রাজা বাহাদুর উল্লাসের সুরে কহিলেন,—বাঃ! এই ত দীননাথের কৌন্সলী এসে দিব্যি সওয়াল জবাব করলে। খাসা!

কিরণপদ কহিলেন,—এ ডেনিয়্যাল হ্যাজ কম্ টু আজমেণ্ট!

কিন্তু কথাটা কল্যাণীর মুখে সহসা উত্তেজনার চিহ্ন ফুটাইয়া দিল। প্রখর দৃষ্টিতে কিরণপদর দিকে চকিতে চাহিয়া এবং ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটাইয়া সে কহিল,—তাহলে 'পোসিয়ার' পার্টটা আমাকেই প্লে করতে হয় রাজা কাকা!

রাজা বাহাদুর পরিহাসের সুরে প্রশ্ন করিলেন,—কিরণকে তুমি সাইলকের জায়গায় দাঁড় করাতে চাও নাকি ?

কল্যাণী মুখখানা কঠিন করিয়া কহিল,—আমি দেখাতে চাই, উনি তার একটা আধুনিক সংস্করণ।

কল্যাণীর কথায় তাহার রাজা কাকার রাজা মুখখানি সিঁদুরের মত রাঙ্গিয়া উঠিল। রাজা বাহাদুর আড় নয়নে সে দিকে

একবার তাকাইয়াই পরক্ষণে সে দৃষ্টি কল্যাণীর মুখের ওপর নিবদ্ধ করিয়া কহিলেন,—বল কি! দেখাতে চাও? তাহলে প্রমাণও আছে?

কল্যাণী উত্তর দিল,—এযুগে প্রমাণ ছাড়া কথার কোনো দাম হয় না।

কিরণপদ তাহার আরক্ত মুখটার ওপর কৃত্রিম ক্রোধের ভাব প্রকাশ করিয়া জানিতে চাহিলেন,—কোন্ কথাটার ওপর এ কটাক্ষ?

কল্যাণী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—এই মাত্র যে কথাটা আমি বলেছি—আপনি সাইলকের একটি নূতনতম সংস্করণ।

কিরণপদ কহিলেন,—সাইলকের ডায়লগটা কোট করে আমি তাহলে অন্যায় করেছি বল?

কল্যাণী কহিল,—সাইলকের কথাটা তুলেই আপনি আজকের এই জটিল ঘটনাটার নিষ্পত্তির একটা সূচনা করে দিয়েছেন।

রাজা বাহাদুর কহিলেন,—সাইলক ত দেনার দায়ে তার খাতকের পেটের মাংস ছুরি দিয়ে কেটে নিতে চেয়েছিল!

কল্যাণী কহিল,—আর ইনি মাংসের ভেতরে যে বস্তুটি থাকে, অদৃশ্য ছুরিতে সেইটিই পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কেটেছেন। এখন তার বিচারের সময় এসেছে। দীননাথবাবু কারুর চাকর নন, তাঁর চরিত্রের জবাবদিহি তিনি যদি করতে না চান, আইনের দিক

দিয়ে আমাদের বলবার কিছু নেই। কিন্তু আপনাকে বলতে পারি যে, ওঁকে খাটো করতে গিয়ে মামলাটা নিজেই ফাঁসিয়ে ফেলেছেন।

কিরণপদ সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—কিসে ?

কল্যাণী কহিল,—সেই কথাই বলছি। সেখানে আর যে ভাবেই হোক, আপনার লোকের নাকের ওপর টাকাটা উনি ফেলে দিয়েছেন, একথা আপনার কাছ থেকেই আমরা শুনেছি। অবশ্য, আপনার সে লোক টাকাটা ছোঁয় নি, রসিদ দেয় নি, আর একজন সেটা হাসতে হাসতে সিন্দুকে তুলেছে। কিন্তু ঘটনাটা সে আপনাকে শোনাতে কসুর করে নি। আপনিও সরেজমিনে তদন্ত করেছেন, ব্যাপারটা সত্যি বলে জেনেছেন, ওঁকে ডেকে পাঠিয়েছেন, অপমানিত হয়েছেন এবং অবশেষে ওঁকে জব্দ করতে এই সব কাণ্ড বাধিয়েছেন। অর্থাৎ, এপর্য্যন্ত যা কিছু আমরা দেখছি বা শুনছি, ওঁর বিরুদ্ধে সে সমস্তই একতরফা। এযুগে এ অবস্থা অচল। একটু আগে নাজীর সাহেবও বলেছেন, ঠিক রাস্তা ধরে আপনারা এখানে আসেন নি। এখন আমার কথা শুনুন—

মুখখানা বিকৃত করিয়া এবং দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রতিবাদের ভঙ্গী ফুটাইয়া কিরণপদ কহিল,—কর্ত্তা রাজা !

রাজা বাহাদুর সহজ কণ্ঠে কহিলেন,—তুমি কি শোনোনি

কিরণ, দেবীপুরের রাজকন্যাই এখন দেবীপুর এষ্টেট চালাচ্ছে, ওর কথাই তোমাকে শুনতে হবে।

কল্যাণী দৃঢ় স্বরে কহিল,—দেবীপুর এষ্টেটের সরকার যা কিছু করবার সামনাসামনিই করে, একতরফা কিছু নেই, এখানেও হবে না। আদালতের যে ব্যাপার আপনি পাকিয়েছেন, আদালতেই তার নিষ্পত্তি হবে। আর সব ব্যাপারের তদন্ত দেবীপুরের সরকারই করবেন। তার আগে কাউকে আমরা দোষী করতে চাই না।

নাজীর এই সময় প্রশ্ন করিলেন,—তাহলে শীলের ব্যবস্থা কি হবে?

কল্যাণী কহিল,—প্রতিবাদী দীননাথবাবুর কোনো সম্পত্তির ওপর শীল হবে না। বাদীর আপত্তি থাকলে রাজা বাহাদুর নিজে প্রতিবাদীর পক্ষে জামীন হতে প্রস্তুত আছেন।

কিরণপদ ম্লান মুখে কহিল,—তার প্রয়োজন হবে না।

অতঃপর কল্যাণী প্রায় সকলকেই চমৎকৃত করিয়া মিলের অধ্যক্ষটির দিকে বিচারকের ভঙ্গীতে চাহিয়া অকুণ্ঠিত-কণ্ঠে কহিল,—মিষ্টার হুইলার, এবার আপনার কথাটা আমরা শেষ করতে চাই। যে রাজার চিঠি পেয়ে আপনি এখানে অনুগ্রহ করে এসেছেন, সে রাজাটি যে আপনার পূর্ব্বপরিচিত এবং তাঁর আচরণও যে রহস্যময়, আপনি তা জেনেছেন। দেবীপুর

সরকার যে অন্যান্য এষ্টেটের মত জেদের বশবর্ত্তী হয়ে কোন কাষ করেন না, বরাবরই তাঁরা ন্যায়নিষ্ঠ, তাঁদের জমি লীজ নিয়ে তার ওপর কারখানা চালিয়ে—সে পরিচয়ও নানা সূত্রে আপনারা পেয়েছেন। এই সরকারও আপনাদের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাশীল ছিলেন যে, কোনো রকম অন্যায়কে আপনারা প্রশ্রয় দেন না; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাতে হচ্ছে, সে ধারণা সম্প্রতি আমাদের ভেঙ্গে গিয়েছে।

মিষ্টার হুইলার স্তব্ধ! প্রায় বাইশ বৎসর কাল তিনি বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালী জাতির সহিত ব্যবসায় সূত্রে সংস্পৃষ্ট; ইহাদের নাড়ীর গতি পর্য্যন্ত তিনি অভিজ্ঞতাসূত্রে লক্ষ্য করিতে যেরূপ দক্ষ, তেমনই তৎপর। এজন্য বাঙ্গলা ভাষাটাকেও এমন ভাবে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, কোনো বাঙ্গালী তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথা কহিলে তিনি বাঙ্গলায় তাহার জবাব দিয়া তাহাকে অবাক করিয়া দিয়া থাকেন। মিল্-এ্যাসোসিয়েসনের কর্ত্তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন, এমন সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ইংরাজ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলায় কোনো মিলের সংস্রবে আসেন নাই।

প্রয়োজনের অনুরোধে এই সহৃদয় বর্ষীয়ান ইংরাজটি এখানে আসিয়া ও পারিপার্শ্বিক জটিল অবস্থার ভিতর জড়াইয়া পড়িয়া একান্ত কৌতূহলের সহিত ইহার উপসংহারটি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

শেষ ভাগে যখন এই সুদর্শনা তরুণীটি ঘটনার সূত্র নিজের হাতে ধরিয়া আশ্চর্য্যভাবে তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিল, তখন তাঁহার মুখের উপর একটির পর একটি বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু অবশেষে এই অসাধারণ মহিলাটি যখন তাঁহাকেও রেহাই দিল না এবং তাঁহার সম্বন্ধে অসঙ্কোচে কঠোর মন্তব্য করিয়া বসিল, তখন তিনি যেন স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই তিনি সে ভাব কাটাইয়া মর্ম্মস্পর্শী স্বরে কহিলেন,—আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি মা! মহীপতি বাবুর সঙ্গে আমাদের কনট্রাক্ট ও দীননাথ বাবুর প্রতি অবিচার উপলক্ষ করেই আপনার এই অনুযোগ। এই অপ্রিয় ঘটনার সময় আপনারা উভয়েই উপস্থিত ছিলেন—অবশ্য পরিচয় তখন জানা ছিল না—এখন স্মরণ হচ্ছে।

কল্যাণী কহিল,—আপনাকে এজন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি মিষ্টার হুইলার, যে আপনি আমার কথাটা স্বীকার করছেন।

হুইলার কহিলেন,—এটা আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্য।

কল্যাণী কহিল,—মানুষ মাত্রেরই এই বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। আর, সেটা আরও শোভন হয় যদি তার সঙ্গে ন্যায়ের সংযোগ থাকে। আপনাকে আমরা একটা প্রশ্ন করতে চাই মিষ্টার হুইলার, আশা করি, আপনি তার যথার্থ উত্তর দিয়ে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করবেন।

হুইলার গাঢ়স্বরে কহিলেন,—আপনাকে দেখে আমাদের চিত্রপটের আরাধ্যা মেরীর মূর্ত্তি মনে পড়ছে। আমার উক্তি যথার্থই হবে।

কল্যাণী কহিল,—মনে করুন মিষ্টার হুইলার, আমাদের সঙ্গে আপনাদের লীজের যে কনট্রাক্ট, তার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। নতুন কনট্রাক্ট করবার সময় আমরা যদি তাতে দুটো নতুন সর্ত্ত বসিয়ে দিই যে, মিলে যতগুলি শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারী কায করে, তাদের বদলে বাঙ্গালী কর্ম্মচারী রাখতে হবে এবং বাঙ্গালী শ্রমিকরাই শুধু সেখানে কায পাবে।—আপনারা রাজী হবেন?

দৃঢ়স্বরে হুইলার উত্তর দিলেন,—না।

কল্যাণী ততোধিক দৃঢ় হইয়া প্রশ্ন করিল,—যদি আমরা বাধ্য করি?

হুইলার উত্তর দিলেন,—আমরা বিজনেস বন্ধ করব।

কল্যাণী কহিল,—যদি অধিকতর সুবিধা আপনাদের দিই?

হুইলার কহিলেন,—যত সুবিধাই দিন না কেন, শ্বেতাঙ্গ কর্ম্মচারীরা সেই প্রতিষ্ঠানে স্থান পাবে না, এ সর্ত্ত কিছুতেই আমরা স্বীকার করতে পারি না!

কল্যাণী শান্তস্বরে কহিল,—আপনার স্পষ্ট কথা শুনে খুসী হয়েছি মিষ্টার হুইলার। আপনার এই স্বীকারোক্তি থেকে আমাদের শিক্ষা করবার অনেক কিছু আছে। এখন বোধ হয়

আপনি একথাও স্বীকার করবেন যে, আপনার দেশ আর জাতিকে রক্ষা করতে যে স্বার্থগত সুবিধাটুকু আপনি অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারেন, সময় বিশেষে সেই স্বার্থটুকুর সুযোগ গ্রহণ করতে আপনি আমার দেশ ও জাতিকে আঘাত দিতে সঙ্কুচিত হন না, ন্যায় ও বিবেক সেখানে অন্ধ হয়ে যায়!

বিচলিত কণ্ঠে মিষ্টার হুইলার কহিলেন,—দীননাথ বাবুর সম্বন্ধে যে অবিচার আমাদের তরফ থেকে হয়েছে, সে সম্পর্কে এ কথা আপনি বলতে পারেন। আমি এ জন্য সত্যই দুঃখিত।

কল্যাণী কহিল,—আমরাও অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি মিষ্টার হুইলার, দীননাথ বাবুর সম্বন্ধে যে অবিচার আপনারা করছেন, যদি অতি শীঘ্র তার প্রতীকার না করেন, তখন আমরাও আপনাদের সম্বন্ধে এমন আচরণ করতে বাধ্য হব, যেটা নিশ্চয়ই প্রীতিকর হবে না।

হুইলার মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—আমরা এদেশে বিজনেস করতে এসেছি, বিবাদ করতে না। যা হোক, আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি মা, মিলের ডাইরেক্টারদের মিটিংএ আমি একথা তুলব এবং তার ফল আপনাকে জানাব।

কল্যাণী হাসি মুখে কহিল,—ধন্যবাদ, মিষ্টার হুইলার।

কিন্তু ঠিক এই সময় দীননাথ দৃঢ়তার সহিত কহিল,—আমি

স্থির করতে পারছি না, আমাকে জিজ্ঞাসা না করে, আমার সম্বন্ধে এ সব আলোচনা করবার কি প্রয়োজন!

পরক্ষণে মিষ্টার হুইলারের দিকে চাহিয়া সে মুখখানা কঠিন করিয়া কহিল,—মিষ্টার হুইলার, আমি আপনাদের কাছে কোনোরূপ অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি না।

দীননাথের কথায় কল্যাণীর মুখশ্রী আশ্চর্য্য রকমে সহসা বদলাইয়া গেল। সুন্দর মুখখানা নিরতিশয় গম্ভীর করিয়া ও দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে একটা সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ ভরিয়া সে দীননাথের দিকে চাহিল, তাহার পর অবিচলিত স্বরে কহিল,—দেখুন, আপনাকে বেষ্টন করে যে সমস্যাগুলো এসে পড়েছে, তার সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত আপনার নিষ্কৃতি নেই। রোগীকে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা দিতে ডাক্তার থাকে। মামলার আসামীকে উদ্ধার করতে যুক্তি দেয় তার উকীল-কৌন্সলী।

উদ্ধত কণ্ঠে দীননাথ কহিল,—আমার মামলায় কে আপনাকে ওকালতনামা দিয়েছে যে গায়ে পড়ে আপনি আমার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করছেন?

কল্যাণী শান্তস্বরে উত্তর দিল,—আপনার সেই প্রবন্ধ। যার সংস্রবে আমরা এখানে অন্নগ্রহণের অঙ্গীকার করেছি। আপনি যদি ওকালতনামা অস্বীকার করতে চান, তাহলে আমরাও অঙ্গীকার প্রত্যাহার করছি।

দীননাথের মুখের ঔদ্ধত্য কোথায় মিলাইয়া গেল, অভিভূতের মত কণ্ঠস্বর গাঢ় করিয়া সে কহিল,—মাপ করুন, আমিই আমার কথা প্রত্যাহার করছি।

দ্বিতীয় পর্ব

তৃতীয় দৃশ্য

এক

দেবীপুর ষ্টেটের যে কয়টি কুমার ও রাজকন্যা বংশলতার সহিত জড়াইয়া বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন, কুমার কিরণপদ রায় তাঁহাদের অন্যতম। এই বংশের ছেলেরা কুমার ও মেয়েরা রাজকন্যা বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতেন এবং সকলেই তাহা সম্ভ্রমের সহিত স্বীকার করিতেন।

বৃত্তিভোগী বংশধরদের অধিকাংশই লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, আগ্রা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাদেশিক সহর গুলিতে রাজার হালে সপরিবার বাস করিতেন, কেহ কেহ বা দেবীপুরের প্রাসাদেই থাকিতেন। কেবল কিরণপদই একাকী কলিকাতায় তাঁহার কর্ম্মজীবনের ক্ষেত্র রচনা করিয়া লইয়াছিলেন।

বাদশাহী আমলে সাহাজাদা ও সাহাজাদীরা মধ্যে মধ্যে যেমন বিদ্রোহ পাকাইয়া খোদ বাদশাহকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন, দেবীপুর ষ্টেটের কোনো কোনো কুমার বা রাজকন্যা দল পাকাইয়া ষ্টেটের অভিবাঞ্ছিত গদীটির উপর লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়াছেন, এই বংশের ইতিহাসে সে দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

শক্তিপদর পিতামহের আমোলে এই বংশেরই এক কুমার বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাহাতে হস্তক্ষেপ করায় বিদ্রোহীর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়। শক্তিপদর

পিতাও একবারে নিষ্কণ্টক হইতে পারেন নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্রোহীর বংশধর চক্রান্ত আরম্ভ করিয়াছিল ; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার আকস্মিক মৃত্যু তাহাতে যবনিকা টানিয়া দেয়।

শক্তিপদ উনিশ বৎসর বয়সে গদীতে বসেন এবং প্রায় ৪৬ বৎসরকাল তাহাতে আসীন আছেন। এই বংশের আর কোনো রাজা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজগী চালাইতে পারেন নাই এবং সকল দিক দিয়া ষ্টেটের এত উন্নতিও আর কাহারো আমোলে হয় নাই। তথাপি ইহার মধ্যে অন্তত তিনবার বৃত্তিভোগী কুমাররা তলে তলে থাকিয়া দল পাকাইয়াছে, ষ্টেটটা নাড়া দিবার জন্য নানারূপ চক্রান্ত করিয়াছে ; কিন্তু শক্তিপদ নিজের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও অপ্রতিহত শক্তি সহায় করিয়া তাহাদের সকল উদ্যমই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

শেষবার যাহারা মাথা তুলিয়াছিল, কুমার কিরণপদর মাথার বুদ্ধি এমন কৌশলে তাহাদিগকে চালাইয়াছিল যে, তাঁহাকে ধরিবার ছুঁইবার কোনো উপায়ই ছিল না। যখন মাথাওয়ালারা রাজার নিকট ধরা দিয়া সোলেনামা করিতে বাধ্য হয় হইল, কিরণপদ সে সময় রাজাকে কহিয়াছিলেন,—কর্ত্তা রাজা ! এদের মতিগতি আমার সারা মন বিষিয়ে দিয়েছে, আমার ইচ্ছে করছে সব ছেড়ে সন্ন্যেসী হয়ে বেরিয়ে পড়ি।

শক্তিপদ যদিও ইহাকে হাতেনাতে ধরিতে পারেন নাই,

কিন্তু এই ছোকরাই যে বিদ্রোহটা পাকাইয়া তুলিয়াছিল, অন্যান্য কুমারদের মাথা বিগড়াইয়া দিয়া নিজের মাথাটি কচ্ছপের শুঁড়ের মত লুকাইয়া ফেলিয়াছিল, আর কেহ না জানিলেও তিনি তাহা জানিতেন। এই ছেলেটি যে তাঁহার অতি সাংঘাতিক শত্রু এবং ইহার দ্বারায় এই বংশের অনিষ্টের আশঙ্কাও প্রচুর, ইহাও তিনি মনে মনে উপলব্ধি করিতেন। এই অবস্থায় কিরণপদর বৈরাগ্য তাঁহাকে চমৎকৃত করিয়া দেয়। কিন্তু তিনি মনের ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গীতে কহিয়াছিলেন,—সে কি হে? তোমার ওপর আমি ভারি খুসী হয়েই ভাবছিলুম—শীঘ্রই তোমাকে সংসারে বেঁধে ফেলবো; সুন্দরী কন্যার সন্ধানে ঘটক পর্য্যন্ত লাগিয়েছি। এমন সময় এ কথা ত ভাল নয়!

কিরণপদ আপত্তির সুরে জানাইয়াছিল,—মাপ করবেন কর্ত্তা রাজা! সংসারী হবার সাধ আমার মোটেই নেই। তবে যদি আমার ওপর প্রসন্ন হয়ে থাকেন, একটা আর্জ্জী আমার রাখতে পারেন।

বল! সম্ভব হলে অবশ্যই রাখ্‌বো।

আমার ইচ্ছে কর্ত্তা-রাজা, কলকেতায় গিয়ে থাকি; আপনি যদি অনুগ্রহ করে সেই মত ব্যবস্থা করে দেন।

কি তোমার অভিপ্রায়?

আমার মাসোহারাটা আর একটু বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তুমি একলা মানুষ, পেছনে চাইতে কেউ নেই; বিয়ে-থাও করতে রাজী নও, এ অবস্থায় যে বৃত্তি তুমি পাও, তাই কি যথেষ্ট নয়?

অন্তের পক্ষে যথেষ্ট হতে পারে, আমার পক্ষে নয়। আপনি ত জানেন, একলা হলেও আমার খরচ অনেক। কতকগুলো লোক আমার মুখ চেয়েই আছে, তাদের দেখতে হয়। তা ছাড়া কলকেতায় থাকতে গেলে খরচ পত্তরও বেশী হবার কথা।

মাসোহারা যা বরাদ্দ আছে, সেটা ত বাড়াবার যো নেই। হ্যাঁ, তবে একটা কথা আছে, যদি ষ্টেটের কোনো কায নিয়ে থাক, তোমাকে তার জন্তে একটা আলাদা টাকা মাসে মাসে দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আমার দ্বারায় কি কায হতে পারে?

ইচ্ছা করলে তুমি অনেক কাযই করতে পারো। বেশ ত, কলকেতায় যাও, ঘোরাঘুরি কর, দেখ, সেখানে তোমার মত কি কায আছে। তবে আমার কথা এই, নূতন কায যদি কিছু চালাতে পারো, তার পেছনে টাকা ঢালতে আমার আপত্তি নেই। একান্তই যদি তোমার টাকার দরকার পড়ে, নিজের খরচের জন্ত কিম্বা স্বাধীন ভাবে নিজেই যদি কোনো কারবার করতে চাও, সেটা তুমি কর্জ্জ নিতে পারো।

কত টাকা পর্য্যন্ত আমাকে কর্জ্জ দেবেন ?

তিন লাখ পর্য্যন্ত ষ্টেট তোমাকে কর্জ্জ দেবে। কিন্তু তার জামিন থাকবে, তোমার মাসোহারা, তোমার কারবার।

তাহলে স্বাধীন ভাবে আমি একলাই কোনো কারবার করবো, আপনি আমাকে টাকা দেবেন।

ইহার পর রীতিমত লেখা পড়া করিয়া শক্তিপদ কিরণপদকে তিন লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিলেন।

এই আদান প্রদানে দুই ধড়িবাজই বুদ্ধির প্যাঁচ কসিতে কসিতে মনে মনে হাসিয়াছিলেন।

কিরণপদ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, সকল কাযের মূলে চাই অর্থ, ইহাই আনে সাফল্য। সুতরাং রীতিমত অর্থ সঞ্চয় করা প্রয়োজন এবং ইহাতে যার শীল যার নোড়া—সেগুলি হাতাইয়া তাহাদের দ্বারাই তার—দাঁতের গোড়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কায।

শক্তিপদও মনে মনে ভাবিতেছিলেন, এই তরুণ প্রতিযোগীটির হাতে এক সঙ্গে এতগুলি টাকা ছাড়িয়া দিয়াই শেষে এমন ভাবে তাহাকে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া বাঁধিবেন যে, কস্মিনকালেও আর সে টুঁ শব্দটি করিতে পারিবে না।

দুই

কিরণপদ কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, পাটের ব্যাপারে সে সময় বরাত ফিরাইবার প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে। তিনি ক্লাইভ ষ্ট্রীটে এক খানা বাড়ী ভাড়া করিয়া রায় কোম্পানীর পত্তন করিলেন। প্রকাণ্ড আফিস বসিল; ম্যানেজার, মুৎসুদ্দি, কেসিয়ার, কেরাণী, দরোয়ান, চাপরাসী কিছুরই অভাব রহিল না। দলে দলে মাড়োয়ারী ও ভুটিয়া দালালদের আনাগোনায় নূতন প্রতিষ্ঠানটি সরগরম হইয়া উঠিল। ঘটনাচক্রে ঠিক এই সময় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত সওদাগরী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত ভাটিয়া দালালদের মন-কসাকষি চলিতেছিল। ব্যবসায় ব্যাপারে মাড়োয়ারী-প্রতিভা তখন নিষ্প্রভ, তরুণ সূর্য্যের মত ভাটিয়া কর্ম্মীরা তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, কিন্তু নিজেদের পাওনা-গণ্ডা সম্বন্ধে ইহাদের অতিমাত্রা রক্ষণশীলতা শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের স্বার্থের অন্তরায় হইয়া পদে পদে গোলযোগ বাধাইতেছিল। পক্ষান্তরে মাড়োয়ারীরা দেখিতেছিল, বাঙ্গালা দেশের জল-বাতাস তাহাদিগকেও বাবু বানাইয়া দিয়াছে, লোটা কম্বল সম্বল করিয়া ভাগ্য ফিরাইবার কথা এখন রূপকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; মোটর না হইলে এখন আর মান থাকে না,

বাগিচা বানাইয়া জলসা বসাইতে না পারিলে ইজ্জত খাটো হয়, রেসে গিয়া বাজী না ধরিলে দিল ঘাবড়াইয়া যায়, এ অবস্থায় প্রতিযোগিতায় ভায়েই তাহাদিগকে কাটিতে হইবে, ধার না থাকিলেও কুচপরোয়া নেই, এতকালের প্রেষ্টিজ কি তামাসার কথা? কাযেই মান বজায় রাখিতে কিঞ্চিৎ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া তাহারা—সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতাঃ—নীতি বাক্যটির অনুসরণ করিয়া বসিল। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীরা খুসী হইয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিলেন এবং ভাটিয়া কর্ম্মীদিগকে জানাইলেন,—ইহাদের আদর্শ অনুসরণ কর।

কিন্তু এই নির্দ্দেশ ভাটিয়াদের চিত্ত স্পর্শ করিল না, তাহারা সরাসরি নূতন প্রতিষ্ঠিত রায় কোম্পানীর আফিসে প্রবেশ করিয়া কিরণপদকে সেলাম দিল। কহিল,—আপিলোককে লাল করিয়ে দিতে হামিলোক আসিয়েছি।

কিরণপদ গোলযোগের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। ইহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিলেন, লক্ষ্মীর বাহনগুলি স্বেচ্ছায় তাঁহার দ্বারে আসিয়াছেন। বাহন বাধ্য থাকিলে লক্ষ্মীও আসিতে বাধ্য হইবেন।

সেই দিনই কিরণপদ ইহাদের অধিকাংশ দাবী অঙ্গীকার করিয়া কনট্রাক্ট করিয়া ফেলিলেন। স্থির হইল, তিনটি বৎসর ইহারা একমাত্র তাঁহারই প্রতিষ্ঠানে তিসি, গালা, শিশা ও পাট সরবরাহ

করিবে। কনট্রাক্টের সঙ্গে সঙ্গে কিরণপদ পঞ্চাশ হাজার টাকা অগ্রিম দাদন দিলেন।

এক বৎসরেই কোম্পানী লাল হইয়া উঠিল। রায় কোম্পানীর মাল প্রতি সপ্তাহে বিলাতী মেলের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়, ব্যাঙ্কগুলি ইহাদের নামীয় ইনভয়েসগুলি পাইতে লালায়িত হয়। বড় বড় শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িল। কর্ম্মকর্ত্তারা হাত কামড়াইতে থাকেন আর মাড়োয়ারী দালালদিগকে লক্ষ্য করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলেন,—তোমরা ওয়ার্থলেস, কোনো কাযের নও।

মাড়োয়ারী দালালরা করযোড়ে উত্তর দিত,—দোষ আমাদের নয়, লছমীজী এক ঠাঁই থাকে না, তাতেই কাম অর্থ ভাগ্য সবই গড়বড় হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বৎসরের শেষাশিষি কিরণ রাজা শক্তিপদকে গর্ব্বিত ভাবে এক পত্র লিখিল। তাহা এইরূপ,—তিন লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে তিরিশ লক্ষ টাকা ্যাপার করছি। ইচ্ছা করলে যে কোনো মুহূর্ত্তে দেনার টা টা চুকিয়ে দিতে পারি। কলকেতার দিকে যদি আসা হয়, দলিলখানা সঙ্গে করে আনবেন। ামনাসামনিই হিসেবটা মিটিয়ে ‍লা যাবে।

কিরণপদর পত্র পড়িয়া শক্তিপদর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির একটা তীক্ষ্ণ ঝিলিক বিদ্যুতের মত খেলিয়া গেল। কায গুছাইয়া দেবীপুর

হইতে বিদায় লইয়া প্রায় দুইটি বৎসর পরে কিরণপদ তাঁহাকে এই প্রথম পত্র লিখিলেও তাহার সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যতগুলি পত্র রেজিষ্টারী ডাকে তিনি পাইয়াছেন, তাহাদের সমষ্টির সংখ্যা উঠিয়াছিল এক শত এক ; আর দুই খানি আসিলেই তাহারা এক শত চারের সংখ্যায় উঠিয়া প্রতিপন্ন করিবে যে প্রতি সপ্তাহেই তাহারা কলিকাতা হইতে নিয়মিত ভাবেই এখানে আসিয়া থাকে।

তিন লক্ষ টাকা পুঁজী লইয়া ত্রিশ লক্ষ টাকার ব্যাপারের বার্ত্তাটা কিরণপদ বাড়াইয়া লিখিলেও অপরপক্ষের পত্রগুলি হইতে শক্তিপদ যে সঠিক সংবাদ পাইয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে তাহার গুরুত্বও অল্প নহে। তিনি তখন সন্দিগ্ধ ভাবে আপন মনেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—হিসেব কি আমার ভুল হয়ে গেল ?

কিন্তু কিরণপদর এই চিঠিখানা তাঁহার মনের সে সন্দিগ্ধ ভাব কাটাইয়া দিল, তিনি নিজের মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন,—না, ভুল আমার হয়নি।

চিঠিখানার জবাব তিনি এই ভাবে দিলেন,—হাত নাগাদ সুদ কসে টাকাটা তুমি তুলে রেখো, ওদিকে গেলেই আমি ওটা তুলে আনবো।

রাজার এই উত্তর পাইয়া কিরণপদ মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন,—সাইলক্! সুদের নেশা এখনো কাটেনি। আচ্ছা দাঁড়াও, আর বছর খানেক থাক্, তার পর করবো বোঝাপড়া ;

তোমার টাকাতেই তোমার দাঁতের গোড়া যদি না ভাঙতে পারি—আমি কিরণপদ রায় নই!

কিরণপদর বয়স এই সময় পঁচিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। প্রিয়দর্শন তরুণ যুবা, রাজপুত্রের মত আদপ কায়দা, প্রভাব প্রতিপত্তির অন্ত নাই। এ অবস্থায় এরূপ রসাল মধুচক্রটি পরিবেষ্টন করিয়া লুব্ধ ভৃঙ্গকুলের নিরবচ্ছিন্ন গুঞ্জন স্বাভাবিক।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিস বাড়ীর ত্রিতলে কিরণপদ রাজার হালে থাকেন। এই একটি লোকের পরিচর্য্যায় জনবারো পরিচারককে হিমসীম খাইতে হয়। ত্রিতলের এক সুসজ্জিত সুবিস্তীর্ণ হল-ঘরে সপার্শ্বদ কিরণপদর খাস-দরবার বসে।

ধনভাই নামে এক বোম্বাইওয়ালা পারসী এবং মলজী নামে এক ভুঁড়িওয়ালা বিকানীর বাসী এই দরবারে তখন পরস্পর তুমুল প্রতিযোগিতা চালাইতেছিল। উদ্দেশ্য এই তরুণ বাঙ্গালী ধনীটিকে আয়ত্ত করিয়া নিজের কোটে আনিয়া ফেলা। ধনভাই এক সময় ধনকুবের হইয়া বসিয়াছিল, কিন্তু এখন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া ও দেউলিয়া আদালতে নাম লিখাইয়া কাঁচা হইয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া সেয়ারের বাজার ও রেসের ঘোড়ার দৌলতে হারানো দৌলত ফিরাইতে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। মলজীও এককালে সহরের মধ্যে সেরা শেঠজী বনিয়া গিয়াছিল; টাকা লইয়া তখন ইহার ছিনিমিনি খেলার কি ধুম! এই খেয়ালের

খেলায় তৎকালে সে যাহাদিগকে অবাক করিয়া দিয়াছিল, এখন তাহারাই মলজীর দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবে—এই লোক-টিই কি সেই খেলোয়াড় ?

মলজীর হাতের সে সকল খেলানা খেয়ালের দরিয়ায় কোথায় তলাইয়া গিয়াছে, কোনো পরিচয়ই তাহাদের আজ নাই। আছে শুধু একটি নিদর্শন এবং সেই টুকুই তাহার বেকার জীবনের এক মাত্র সান্ত্বনা—লিলুয়ার প্রান্তদেশে বিস্তীর্ণ উদ্যান সমন্বিত সুরম্য ভবন—কৃষ্ণালয়। বঙ্গরঙ্গভূমির বিখ্যাত গায়িকা-অভিনেত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়ার মনোরঞ্জনের জন্য প্রায় দেড় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই মনোরম উদ্যান ভবনটি আধুনিক পরিকল্পনায় রচিত ও সজ্জিত হইয়াছিল।

তিন

কৃষ্ণপ্রিয়াকে লইয়া সে সময় বিলাসী ধনী সমাজে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল, কিন্তু মলজী একদা তাহাকে লিলুয়ার মনোরম বাগান বাড়ীখানি দেখাইয়া প্রতিযোগিদের কপালে তেঁতুল গুলিয়া দিল।

বাগানের ফল ও ফুলের বাহার, দিঘীর তকতকে জলে নানাবিধ মাছের সঞ্চার এবং দামী দামী আসবাব-পত্রে সাজানো সুচিত্রিত ঘরগুলির পারিপাট্য তন্ন তন্ন করিয়া তরুণী কৃষ্ণাকে দেখাইয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিল,—কেমন?

সোনাগাছির বসতি বহুল রূপজীবিনী—পল্লীর একটা গলীর তিনতালা একখানা বড় বাড়ীর দ্বিতলের দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়া তাহার মধ্যেই প্রেম কুঞ্জ সাজাইয়া কৃষ্ণপ্রিয়া দুধের সাধ ঘোলে মিটাইয়া থাকে। সুতরাং তাহার তুলনায় লিলুয়ার এই উদ্যান-ভবন ভূস্বর্গের মতই যে মনে তাহার মোহের সৃষ্টি করিবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? শেঠজীর প্রশ্ন শুনিয়া সে মুগ্ধ ভাবেই উত্তর দিল,—চমৎকার! এখান থেকে যেতে যেন মন চায় না; ইচ্ছে করে, এইখানেই থাকি।

মলজী কহিল,—আচ্ছি বাত, থাক না; কলকেতার সেই কবুতরের বাসায় ঘুমিয়ে কোন সোয়াস্তি আছে? আরে লিলুয়া

ত দুনিয়াকা আলো আছে, হাওয়া-পানি সোনো ভালো, দিল-তবিয়ত ভারি ভালো থাকবে।

কৃষ্ণা বহিল,—তামসা করছ ?

মলজী কহিল,—না, দিলের কথাই খুলে বলছি। এ মোকাম ত খালি পড়ে থাকে, তুমি যদি সত্যিই এখানে থাকতে চাও, জিন্দিগী ভোর আরামসে কাটতে পারো, কিছু পরোয়া নেই।

কৃষ্ণা গম্ভীর হইয়া কহিল,—সর্ত্ত কিছু আছে ত, সেটা কি ?

মলজী হাসিয়া উত্তর দিল,—তুমি ভারি চালাক আছ, কথার সাথেও কায আদায় করতে চাও।

কৃষ্ণা কহিল,—নইলে তোমাদের মতন কাযের মানুষকে চরাতে পারি।

মলজী কহিল,—তুমি লোক ত হামি লোককে কামসে ছিনায়ে গাইয়া বানায়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণা কহিল,—সেটা শুধু দুধের আশায়, দুধটুকু ফুরুলেই পিঁজরাপোলের ব্যবস্থা।

মলজী কহিল,—বাঃ—খাসা! তোমার কথা হামার ভারি মিষ্টি লাগে। যাক্, যে কথা তুমি কইলে, হামি তাই বলি।

কৃষ্ণা কহিল,—আমি তাই শুনতে চাই। উমরভোর এই বাগান বাড়ী হামি লোক ভোগ দখল যদি করি, তুমি লোক তার জন্তে কি চাও ?

মলজী হাসিয়া কহিল,—চাই খালি তোমাকে।

কৃষ্ণা প্রশ্ন করিল,—কি ভাবে? এখানেই দিন রাত বেঁধে রাখবে নাকি?

মলজী কহিল,—না না, তা কেন; তুমি থিয়েটারে কাম কর; গাওনা কর, যাওয়া আসা কর—ব্যাস। আউর কোনো আদমী লোক তোমার সাথে দোস্তী করবে না। ও লোককে বিলকুল বাতিল করতে হোবে, কুছু আমে[illegible] না দিবে।

কৃষ্ণা মনে মনে কি ভাবি[illegible] কহিল,—বেশ আমি রাজী। তবে লেখা পড়া হোক। তার পরই আমি তোমার।

অতঃপর রীতিমত দলিল করিয়া এই মর্ম্মে লেখাপড়া হইল যে, আজীবন কৃষ্ণপ্রিয়া লিলুয়ার তপশীলবর্ণিত বাগান বাড়ীতে বসবাস করিবে, মলজী তাহার অভিভাবক স্বরূপ হইয়া এখানে থাকিবে, নিজ ব্যয়ে কৃষ্ণার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া দিবে এবং যাহাতে তাহার অবাঞ্ছিত বাহিরের কোনও লোক এখানে আসিতে না পারে সে বিষয়ে মলজীর পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে।

ইহার পরেই সোনাগাছির বাসা ভাঙ্গিয়া লিলুয়ার প্রমোদ ভবনে কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার মাতা ও আশ্রিতাদের লইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বৎসর ঘুরিতে না ঘুরিতে মলজীর ব্যবসায়ে মন্দা পড়ায় বাজার দেনা যখন তাহার নাসিকা পর্য্যন্ত ছাপাইয়া উঠে, তখন আর একখানা নূতন দলিলে উক্ত বাড়ী-বাগান কৃষ্ণপ্রিয়ার নামে

দেড় লক্ষ টাকায় বিক্রয়-কোবালা সম্পাদিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই দলিলে লিখিত টাকাটি বুঝিয়া পাইবার কথা লেখা থাকিলেও তাহার আদান প্রদান মোটেই হয় নাই; পাওনাদার-দিগকে বঞ্চিত করিবার জন্যই লিলুয়ার এই মূল্যবান সম্পত্তিটুকু কৃষ্ণপ্রিয়ার নামে বেনামী করিয়া মাস সাতেক পরে মলঙ্গী দেউ-লিয়া আদালতের শরণ লইয়া সর্ব্বহারা হইবার দরখাস্ত দায়ের করিয়া দেয়।

অতঃপর নিশ্চিন্ত হইয়াই মলঙ্গী কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রেমসাগরে দেহ মন ঢালিয়া দিল। বেনামীর সময় মলঙ্গী তাহাকে বলিয়াছিল,—বিশ্বাস করে আমার জান মান আর রুজি-রোজগারের চাবিটি তোমার কাছে যেমন রাখছি, তুমি তেমনই আখেরে ইমান রেখো।

কৃষ্ণা তখন মলঙ্গীর বিপুল ভুঁড়িটির উপর গোটা দুই তুড়ি দিয়া বলিয়াছিল,—চাবিটি তোমার এখানে বেঁধে রাখাও যা, আমার আঁচোলে থাকাও তাই। যেই জানবো, দিন তোমার ফিরেছে, আমিও তখনি ঐ দলিল আবার দেব পালটে।

কিন্তু তাহার পর আরও পাঁচটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মলঙ্গীর দিনও ফিরে নাই, এবং চাবিটিও কৃষ্ণপ্রিয়া ফিরাইয়া দিবার প্রয়োজনটুকু উপলব্ধি করে নাই। তবে মলঙ্গীর বিপুল ভুঁড়িটির তোয়াজ করিতে তাহার পক্ষ হইতে

কোনরূপ অবহেলা হইয়াছে, এ কথা কেহই বলিতে পারিবে না। মলজী ত নহেই, যেহেতু তাহার ভুঁড়ির আয়তন কৃষ্ণার পরিচর্য্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা পরিপুষ্টই হইয়াছে।

পক্ষান্তরে দলিল পরিবর্ত্তনের পরেই প্রথম দলিলের বিধি-ব্যবস্থাগুলিও ধীরে ধীরে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্ব দলিলের সর্ত্ত ছিল, মলজী কৃষ্ণাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, কিন্তু এখন কৃষ্ণপ্রিয়াই মলজীর রক্ষণাবেক্ষণ করে। তখন গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় দিত মলজী, এখন এই বাবদে যাবতীয় ব্যয়ভূষণ কৃষ্ণাকেই করিতে হয়। তখন দিঘীর জলের মাছগুলি শুধুই শোভার সঞ্চার করিয়া চক্ষুকে তৃপ্তি দিত—ধরিবার সাধ্য কাহারও ছিল না, এখন মলজী নিজেই ছিপ লইয়া মাছ গাঁথে এবং মাছ ভাজার গন্ধে লাফাইয়া উঠে না। চাকরদের মুখেও শুনা যায় যে, আহারাদি বিষয়ে মলজী এখন অতিশয় উদার পন্থী হইয়াছে। তখন মলজীর কড়া হুকুম ছিল, তাহার হুকুম ভিন্ন কোনো পুরুষ দেউড়ীর ভিতরে ঢুকিতে পারিবে না, এখন কৃষ্ণার নিয়োজিত নূতন গুর্খা দরোয়ান কোমরে কুকরী বাঁধিয়া সময় সময় মলজীকেই মাঝীর হুকুম বাতলায়! পরিচিত অপরিচিত কত লোকই এখন কৃষ্ণার সহিত দেখা করিতে আসে, কত কথা—কত পরামর্শই হয়, ইহাও মলজীর সহিয়া গিয়াছে।

প্রথম প্রথম সে ইহাতে ভারি খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল, দুই

চক্ষু পাকাইয়া কহিয়াছিল,—এ কায ঠিক না আছে, ও সব হবেক না।

কিন্তু কৃষ্ণা যখন মুখখানা শক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তাহলে চলবে কিসে? মাসে হাজার টাকা খরচ, কে যোগাবে শুনি? ওরা ত আর ইয়ারকী দিতে আসে না—রুজি-রোজগারের উপায় ত ওরাই,—তবে?

মলজী তখন নিরুত্তরে সরিয়া যায়। সে বুঝিয়া লয় যে, যখন বিষটুকু তাহার নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, বৃথা ফোঁস করিয়া কি লাভ? সুতরাং সহ্য করাই শ্রেয়ঃ। অতঃপর বুদ্ধিমানের মত সে অহিংসার ব্রত গ্রহণ করিয়া রাগটুকু একেবারে জলাঞ্জলি দিল।

কিন্তু ইহাতেও সে নিষ্কৃতি পাইল না! প্রত্যহই আহারাদির পর মলজী কলিকাতায় কাযের ধান্দায় আসিত, দুই একটা কাযও ধরিত, কিন্তু এমনই তাহার ক্ষতির বরাত চলিয়াছিল যে, কোনো কাযেই পয়সার মুখ দেখিতে পাইত না, বরং দণ্ডই দিতে হইত। প্রত্যহ বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় কৃষ্ণা তাহাকে দুইটি করিয়া টাকা দিত, কিন্তু মলজী কোনো মাসেই এমন কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিত না, যাহা কৃষ্ণার হাতে দিয়া তাহার মুখ রক্ষা করা সম্ভব হইত। সময় সময় কাজের নেশায় মাতিয়া যে লোকসান করিত, তাহাও কৃষ্ণা মুখ ভার করিয়া যোগাইত এবং সেই সূত্রে উপদেশ দিত, তোমার যা মুরদ বোঝা গেছে, আর

কায ক'রে দরকার নেই। এখন রোজ রোজ যদি না বেরোও, তাহলে বরং রোজকার দুটো করে টাকা বেঁচে যায়।

মলজী কিন্তু একথা কাণে তুলিত না। রায় কোম্পানীর মালিক কিরণপদর সহিত তখন তাহার রীতিমত মাথামাথি হইয়াছে। ধনজীর পাল্লায় পড়িয়া কিরণপদর মাথায় তখন রেসের নেশা নূতন ঢুকিয়াছে, রেসের ময়দানে মলজীকেও কিরণপদর সাথী হইয়া টিপে সহায়তা করিতে হয়।

কিরণপদর অর্থে মধ্যে মধ্যে সেও দুই একটা বাজী ধরে, হারিলেও ভয় নাই—যেহেতু টাকাটা তাহার নিজের নহে; এবং জিতিলেও ষোল আনাই লাভ, কেননা, কিরণপদ তাহা ফেরৎ লইবার নামটিও করে না। সুতরাং এমন দাঁও এবং ভাগ্য ফিরাইবার সুযোগ সে ছাড়িবে কেন?

এতদিন কিরণপদ কেবলই কারবার লইয়া মত্ত ছিল; রেসের উন্মাদনা তাহার এই এক ঘেয়ে জীবন যাত্রায় অতঃপর একটা বিচিত্রময় নূতন পন্থা দেখাইয়া দিল।

এখন কিরণপদর খাস কামরায় প্রধান আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছে—রেসের ঘোড়া। রেসের মরশুমটাই সওদাগরী আফিসগুলির কায কর্ম্মের সেরা মরশুম এবং এতদিন যে উৎসাহী মানুষটির মন ও মস্তিষ্ক সওদার চিন্তাতেই আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত, এখন সেখানে সওদার সূক্ষ্ম সুতাগুলি ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া ঘোড়ার

দৌড় হইয়া থাকে। শেষে এই ঘোড়ার নেশা এমনই নিবিড় হইয়া উঠিল যে, পরের ঘোড়ার পিছনে টাকা ঢালিয়া কিরণপদর সাধ মিটিল না, রেসের মাঠে নিজস্ব ঘোড়া ছুটাইবার জন্য সে ক্ষেপিয়া উঠিল। উপদেষ্টা ধনজী শনির মতই কিরণপদর অদৃষ্টের পথে দাঁড়াইয়া নিশান নাড়িতেছিল। বিদেশের ঘোড়া ব্যাপারী-দের কাছে ঘোড়ার অর্ডার গেল, ধনজীরও ভাগ্য বরাত ফিরিল, এই ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে হর্তাকর্তা সে নিজেই,—কিরণপদ সাদা চেকে নাম সহী করিয়া দিতেও দ্বিধা করে না; তাহার শুধু জিদ—সেরা সেরা ঘোড়া চাই, টাকার জন্য পরোয়া নাই। খব-রের কাগজে খবরটা বাহির হইয়া গেল,—মিষ্টার কে, পি, রায়ের গোটা কয়েকটি সেরা ঘোড়া ইয়োরোপ হইতে আসিতেছে, আগামী সিজনে তাহারা রেসে ছুটিবে।

কৃষ্ণা ইদানীং সন্দিগ্ধ ভাবেই মলজীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে-ছিল। এখন সে বাহির হইবার সময় প্রত্যহ অভ্যাসমত টাকা দুইটির জন্য হাত পাতে না অথবা ভুলিবার ভান করিয়াই যেন চলিয়া যায়। এক একদিন কিছু কিছু সৌখীন জিনিসপত্রও কিনিয়া আনে। মলজীর অগোচরে কৃষ্ণা তাহার পকেট হাতড়াইয়া কোন কোন দিন দুই চারিখানা নোটও দেখিতে পায়। কৃষ্ণা অবাক হইয়া ভাবে, ব্যাপার কি? কোথা হইতে মলজী টাকা উপায় করে! কিন্তু কই, কিছু ত তাহার কাছে ভাঙ্গে নাই!

একদিন সে জোর করিয়া মলজীকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ব্যাপার কি বল ত শুনি? যদি ভালো চাও, কিছু না লুকিয়ে সব কথা আমাকে খুলে বল।

মলজীর তখন সসেমিরে অবস্থা। ধনজী দুই হাতে টাকা লুটিয়া তাহার ভাঙ্গা কপাল যোড়া দিতেছে—অবাক হইয়াই সে তাহা দেখিতেছিল, উচ্ছিষ্টের মত যে ছিঁটে ফোঁটা তাহার পকেটে আসিতেছিল—তাহা কিছুই নয়; অথচ তাহার কিছু করিবারও নাই। ধনজীর নামে কিরণপদকে কিছু বলিতে গেলেই সে গম্ভীর হইয়া বলে,—ঘোড়ার ব্যাপারে ধনজী ওস্তাদ, ওর পেছনে লেগে তোমার কি লাভ? আদার ব্যাপারী হয়ে জাহাজের খবরদারী করা কি ঠিক?—অতঃপর মলজীর মুখ বন্ধ হইয়াই গিয়াছে, তাহার বলিবার বা করিবার আর কি আছে?

এই সময় কৃষ্ণা তাহাকে ব্যাপারটি জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল। মলজী ভাবিল, মন্দ কি,—বলি না কেন সব কথা, যদি কোনও কিছু মতলব ও দিতে পারে—সে ত ভালোই।

তখন সে কিরণপদর সম্বন্ধে সমস্ত কথা কৃষ্ণাকে খুলিয়া বলিল।

কৃষ্ণা একাগ্রচিত্তে সমস্ত কাহিনী শুনিল এবং কথার মধ্যে যেখানে যেখানে দ্বিধা বা শৃঙ্খলার অভাব ছিল, জেরা করিয়া সেগুলিও বাহির করিয়া লইল।

মলজী জিজ্ঞাসা করিল,—মালুম কুছু হল ?

কৃষ্ণা উত্তর দিল,—বহুত।

পুনরায় মলজীর প্রশ্ন,—সলা কুছু বাতলাবে নাকি ?

কৃষ্ণার উত্তর,—জরুর।

মলজী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কৃষ্ণার দিকে চাহিয়া কহিল,—বাতলাও ত শুনি।

কৃষ্ণা দুই চক্ষুর দৃষ্টি প্রখর করিয়া মলজীর দিকে শুধু চাহিল, মুখে বাণী নাই। কিন্তু তথাপি সেই দৃষ্টিই যেন মলজীকে শাসাইয়া দিল।

মলজী কহিল,—বাপরে—কি হল ?

কৃষ্ণা সহসা উঠিয়া মলজীর ভুঁড়িটি ঠেসিয়া দাঁড়াইল এবং পরক্ষণেই তাহার হাতের দুইটি আঙ্গুলের সংযোগে মলজীর লোমশ কানটির উপর একটা প্রবল টান দিয়া কহিল,—ইচ্ছে করছে, তোমার কানটা ধরে গড়ের মাঠে ঘোড়দৌড় করাই, আর ঐ ভুঁড়িটা ট্যাপ করে খানিকটা বোকামী বার করে দিই—

মলজী বিরক্ত হইয়া কহিল,—আঃ—ছোড়-ছোড়জী—লাগে ; —ধনজীর ভাগ দেখে হামার ছাতি ফাটিয়ে যাচ্ছে, তুমি লোক কোথায় সলা দেবে না দিল্‌লাগি সুরু করিয়ে দিলে—বাঃ !

কৃষ্ণা আবার ফিরিয়া তাহার সোফাটার উপরেই গম্ভীর হইয়া

বসিল। তাহার পর দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ করিয়া কহিল,—বোকা জাম্বুমান! আগে মতলব নাওনি কেন, এখন যে—টু-লেট!

কৃষ্ণা সময় সময় তাহার কথায় ইংরাজী শব্দও দুই একটি ব্যবহার করিত; যেহেতু মলজী ওটা বড়ই পছন্দ করিত। তবে পরক্ষণেই কৃষ্ণাকে আবার ইংরেজী কথাটার অর্থ মলজীকে বুঝাইয়া দিতে হইত এবং মলজীও সেটা কায়দা করিতে প্রয়াস পাইত।

মলজী কহিল,—তুমি আজ খালি খালি দিল্‌লাগি লাগিয়েছ। আরে জী, মতলব কা সাথ, খালি মোকাম কেরায়াকা বাত হামি ত কুছু বুঝছে না।

মলজী ভাল করিয়াই জানিত যে, 'টু-লেট' বলিতে খালি মোকাম ভাড়া দেওয়া হইবে বুঝায়। কৃষ্ণার কথাটার ঐ অর্থ ধরিয়াই সে এইরূপ মন্তব্য করিল।

কৃষ্ণা হাসিয়া কহিল,—বোকারাম, এত করেও তোমাকে ইংরিজীতে লায়েক করতে পারলুম না! তখন তাহাকে ইংরাজীর দুইটি কথার বিভিন্ন অর্থ মলজীকে বুঝাইয়া দিতে হইল।

মলজী মুখখানা রীতিমত গম্ভীর করিয়া জানাইল,—আরে জী, ও খচ্চুরী ভাষা হামি লোক কুছু সমঝে না—ছোড় দেও ভাই। বাংলা বোলোতো—

কৃষ্ণা তখন একটি ঘন্টা ধরিয়া তাহাকে যে সব কথা বুঝাইল,

যে সকল পরামর্শ দিল, কাযে নামিবার যে নূতন রাস্তাটি দেখাইয়া দিল এবং তাহার এই নির্দ্দেশগুলি গোপন রাখিবার জন্ত যে ভাবে সীতারামের নামে কঠোর শপথ করাইয়া লইল, তাহাতে মলজীর মাথা একেবারে ঘুরিয়া গেল। সে বিস্ময়ানন্দে উৎফুল্ল হইয়া কহিল,—বাঃ জী বাঃ! এবার হামিলোক বাজী জিতবো।

অতঃপর অদৃষ্টের পথে নূতন বাজী ধরিবার জন্ত মলজীকে সম্মুখে শিখণ্ডীর মত রাখিয়া কৃষ্ণার যে অপূর্ব্ব অভিযান চলিল, পরবর্ত্তী তিনটি বৎসরের মধ্যেই তাহার ফল সকলকেই চমৎকৃত করিয়া দিল।

কৃষ্ণার ছিল একটা আশ্চর্য্য রকমের অন্তর্দৃষ্টি, পুরুষের চিত্তের ভিতরটা পর্য্যন্ত তাহার প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িত। মানুষকে বাধ্য ও ইচ্ছামত চালিত করিবার শক্তিও ছিল তাহার অসাধারণ; যাহাকে সে জয় করিবার জন্ত সঙ্কল্প করিত, সে দুর্ভাগ্য কোন মতেই স্বাতন্ত্র বজায় রাখিতে পারিত না। সে নিজে সকলের অন্তরের ভিতরটা সুস্পষ্ট দেখিয়া লইত, কিন্তু তাহার অন্তরটি এমনই দুর্ভেদ্য ছিল যে, চর্ম্মচক্ষু দিয়া কেহই তাহার সত্যকার কোন পরিচয় পাইত না। এ সকলের উপর ছিল কৃষ্ণার কমনীয় রূপ, অনবদ্য সৌন্দর্য্য এবং তাহার একটা চাঞ্চল্যকর আকর্ষণ; তাহার সেই উন্মাদনাময় রূপবহ্নির অভিমুখে রূপ-মুগ্ধের দল পতঙ্গের মতই ছুটিয়া যাইত।

কিরণপদ রায়ের মত চতুর ধড়িবাজও আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, শেঠজীর মধ্যবস্থায় প্রথম দর্শনের দিনটীতেই কৃষ্ণার নিকট তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে আত্মসমর্পণ করিলেন।

চার

আরও তিনটী বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কিরণ-পদ দেবীপুর ষ্টেটে শক্তিপদর নিকট কোন চিঠিপত্র পাঠাইবার অবসর পান নাই, শক্তিপদও এ পর্য্যন্ত কোনও তাগিদ দেন নাই।

চতুর্থ বৎসরের প্রথমেই একদা হঠাৎ রায় কোম্পানীর কার্য্যা-লয়ে কিরণপদর খাস কামরায় শক্তিপদকে সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া সপারিষদ কিরণপদ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! তাঁহার বিস্ময় এতই নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল যে, সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া কর্ত্তা রাজার পায়ের তলায় মাথাটি ঠেকাইতেও ভুল করিয়া ফেলিলেন। যদি শক্তিপদর মৃত পুত্র দুর্গাপদ তাঁহার আফিস ঘরে এভাবে আসিয়া দাঁড়াইত, তাহা হইলে কিরণপদর অন্তরে যে বিস্ময় প্রবাহ বহিত, শক্তিপদর উপস্থিতি জানিত বিস্ময় ভাব তাহা অপেক্ষা অল্প নহে।

ইদানীং আফিসে কিরণপদর আবির্ভাব কচিত দেখা যাইত। একদিন এই ফারমটীর যে প্রতিষ্ঠা এবং বাজারে কিরণপদর যে সুনাম ছিল, নানাদিক দিয়াই এখন তাহাতে ঘাটতি দেখা দিয়াছে। চারিদিকেই কারবারের দেনা বিভীষিকা দেখায়, মহাজনদের তাগাদায় কিরণপদকে বিব্রত হইতে হয়। সকল দিন এজন্য তিনি আফিসে আসেন না এবং যে দিন আসেন, তাহাও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নহে। কিন্তু আজ যে কিরণপদ আফিসে এই মাত্র

আসিয়া খাসকামরায় পারিষদগণের সহিত ঢুকিয়াছেন, শক্তিপদ কেমন করিয়া তাহা জানিলেন?

ঘরের ভিতরে যাহারা ছিল, সকলেই এই বর্ষীয়ান পুরুষটীর দৃপ্ত মূর্ত্তিটির দিকে অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কাহারও মুখে কথা নাই।

কথা কহিলেন প্রথমেই শক্তিপদ নিজে। স্তম্ভিত কিরণপদর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—কথা আছে কিরণ, এঁরা এখন বেরিয়ে গেলেই ভালো হয়।

পারিষদবৃন্দ বুঝিল, আগন্তুক 'কেউকেটা' নহে। তাহারা বুদ্ধিমানের মতই স্থান ত্যাগ করিল, অবশ্য তৎপূর্ব্বেই কিরণপদর বিস্ময়াহত দৃষ্টি পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ভঙ্গীতে ইহাদিগকে বিদায় দিয়াছিল।

কিরণপদর সম্বর্দ্ধনার অপেক্ষা না করিয়াই শক্তিপদ একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি সার্চ্চ লাইটের মত কিরণপদর মুখের উপর নিক্ষেপ করিলেন।

এতক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াই যেন কিরণপদ তাড়াতাড়ি উঠিল এবং শক্তিপদর পদতলে মাথাটি নত করিয়া যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

শক্তিপদ কহিলেন,—হয়েছে। এখন ব'স। কাযের কথা হোক।

কিরণপদ শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—ভালো আছেন ?

শক্তিপদ উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই, চেহারা দেখেই বুঝতে পারছ না !

কিরণপদ স্বর অতিশয় কোমল করিয়া কহিল,—কবে আসা হল ?

শক্তিপদ কহিলেন,—আজই সকালে, পাঞ্জাব মেলে।

কিরণপদ কহিল,—খবর পেলে আমি ষ্টেসনে লোকজন নিয়ে হাজির থাকতুম।

শক্তিপদ হাসিলেন। তাহার পর সহসা কহিলেন,—লোকজনের অভাব এ পর্য্যন্ত হয় নি। অভাব হয়েছে টাকার ; সেই জন্যই ছুটে এসেছি।

কিরণপদর বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। কথাটার উত্তর তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু বুকের ভিতর দিয়া একটা কথা কণ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিতেছিল এবং সেইখানেই তাহা মিলাইয়া গেল ; সেই শব্দটি হইতেছে—সাইলক !

কিন্তু শব্দটি কণ্ঠের বাহিরে না আসিলেও বৃদ্ধ কি তাহার মুখের ভঙ্গীটুকু লক্ষ্য করিয়াই মনের অস্পষ্ট উত্তরটুকু নিজের অন্তর্দৃষ্টিতেই পাঠ করিলেন ?

একটু হাসিয়া শক্তিপদ কহিলেন,—দুনিয়ায় আজকাল টাকাটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কাউকে শক্ত করে দেয়,

কেউবা এর পাল্লায় পড়ে গরম হয়ে উঠে। আবার এমনি মজা, নরম হলেও নিষ্কৃতি নেই, তখন বেড়ালগুলো পর্য্যন্ত আঁচড়ায়।

কিরণপদ বৃদ্ধের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া কথা গুলির অর্থ উপলব্ধি করিবার প্রয়াস পাইলেন।

কিন্তু তাঁহাকে চিন্তা করিবার অবসর না দিয়া শক্তিপদ পরক্ষণেই প্রশ্ন করিলেন,—হিসেব তোমার তৈরী?

প্রশ্নটা যেন কিরণপদর কানে পটোকার আওয়াজের মত বাজিয়া দেহ মন আড়ষ্ট করিয়া দিল। একটু পরে আত্মসম্বরণ করিয়া শুষ্ককণ্ঠে সে জানাইল,—আজ্ঞে না—

—কেন? এত বড় আফিস, লম্বা হলখানা জুড়ে অত গুলো টেবিল চেয়ার, র‍্যাক বোঝাই খাতা-পত্তর; হিসেব না হবার কারণ?

—আপনি এত দিন গা করেন নি, তাই ওটা চাপা পড়েই আছে।

—থাকুক, তার জন্যে কাজ আটকাবে না, আমার হিসেব ঠিক আছে। তুমি চেক বই বার করে, দলিল আমি সঙ্গেই এনেছি।

মনে এবার কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া কিরণপদ কহিল,—আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এ সব কি তাড়াতাড়ির কায!

শক্তিপদ তাঁহার জামার পকেট হইতে এক খণ্ড কাগজ

বাহির করিয়া সেখানি কিরণপদর সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন; অভিভূতের মতই কিরণপদ সেখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

গম্ভীর ভাবে শক্তিপদ কহিলেন,—চিনতে পেরেছ বোধ হয়, তোমারই হাতের লেখা, বছর কতক আগে এই চিঠিখানা পাঠিয়ে জানিয়েছিলে—তিন লাখ টাকায় তিরিশ লাখের ব্যাপার করছি, ইচ্ছে করলেই যে কোন মুহূর্ত্তে টাকাটা চুকিয়ে দিতে পারি!—এর পর ওকথা তোমার খাটে? জোঁকের মুখে যেন নূন পড়িল, ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়াই কিরণপদ বসিয়া রহিল; দুই চক্ষু তুলিয়া চাহিবার শক্তিটুকুও বুঝি সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

শক্তিপদ কহিলেন,—তুমি জানো, প্রমাণ ছাড়া আমি কথা বলি না; আর আমার মুখ দিয়ে যা বেরোয় তা বাজে হয় না। যখন আজ এসেছি, কায গুছিয়ে তবে উঠবো। কোনো বায়নাক্কা আমি শুনব না।

বৃদ্ধের এই কথাগুলি কিরণপদর দেহের তরল রক্ত বুঝি তাতাইয়া দিল। সহর কলিকাতার বুকের উপর—তাঁহারই আফিসে বসিয়া এত বড় তেজের কথা এই বৃদ্ধ সাইলকটা বলিতে সাহস পাইতেছে, আর সে মূঢ়ের মত শুনিতেছে! হলই বা মহাজন, এমন কত মহাজনকেই ত সে চরাইতেছে কিন্তু তাহার খাস-কামরায় আসিয়া এমন স্পর্দ্ধা ত কেহ কখনও

প্রকাশ করিতে সাহস পায় নাই! এতক্ষণ পরে কণ্ঠের উপর জোর দিয়া সে কহিল,—কি করতে চান?

—এর হেস্ত নেস্ত।

—আজই?

—এই চেয়ারে বসেই।

দেহের সমস্ত রক্তটা বুঝি এবার তপ্ত হইয়া কিরণপদর মাথায় উঠিল। অসংযত স্বরে সে এবার কহিল,—মনে রাখবেন, এটা দেবীপুর নয়।

শক্তিপদ দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—বর্ত্তমানে এটাই দেবীপুর—যখন শক্তিপদ রায় এখানে বর্ত্তমান।

কিরণপদ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হইয়া তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু শক্তিপদর সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় হাতখানা লোহার বেড়ীর মত বেষ্টনি দিয়া তাঁহাকে বাধা দিল!

কিরণপদ বুঝিলেন, এখনও বৃদ্ধের দেহে অসুরের শক্তি; ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে দুইটি বাহুর পেষণে দিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে পিষিয়া ফেলিতে সমর্থ। কিরণপদ এক নিমেষেই নিজের অবস্থাটা বুঝিয়া লইলেন। আফিসের কর্ম্মচারীরা চলিয়া যাইবার পরেই তিনি সপারিষদ এই ঘরে ঢুকিয়াছিলেন, শক্তিপদর আবির্ভাবে ও নির্দ্দেশে তাহারা খাস কামরা হইতে চলিয়া গেলেও, আফিসে তাঁহার যে দরোয়ানগুলি আছে, তাহাদের সংখ্যাও অল্প নহে,

এবং নিকটেই রহিয়াছে টেলিফোনের রিসিভার; এক মুহূর্ত্তেই সে অনেক কিছুই করিতে পারে। কিন্তু তাহা কি উচিত? বরং একটা কেলেঙ্কারী প্রকাশ পাইবে, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাও ঠিক নয়!

মনের এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় শক্তিপদই সহসা কহিলেন,—দলিলের আসল সর্ত্তটা হচ্ছে এই যে, তিনটি বছরের ভেতরেও যদি কোনো পেমেন্ট না হয়, আদালতের সাহায্য না নিয়েই তোমার যা কিছু নিজস্ব সম্পত্তি—এমন কি বৃত্তি পর্য্যন্ত বাজেয়াপ্ত করবার এক্তিয়ার আমার থাকবে।—সর্ত্তটা তোমার মনে আছে?

কিরণপদ কহিলেন,—দলিলে অমন লেখা থাকে, কিন্তু বাজেআপ্ত কিছু করতে হলে আদালতের সাহায্য না নিয়ে করা যায় না।

শক্তিপদ কহিলেন,—যায়, টাকা আর বুকের পাটার যদি রীতিমত জোর থাকে। এখন আমার একটা কথা—টাকা তুমি মেটাবে, এই চিঠিতে যেমন লিখেছিলে?

কিরণপদ কহিলেন,—তখন হ'লে হত, বছর খানেক আগে এলেও হত। কিন্তু এখন টাকাটা আটকে গেছে, আরও বছর খানেক সময় না দিলে দেওয়া সম্ভব হবে না।

শক্তিপদ কহিলেন,—কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করাও আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। সর্ত্তমত কাযগুলোই তাহলে সেরে ফেল, আমি

সেজন্যে তৈরী হয়েই এসেছি ; আমার কায, কথা, আর হিসেব—এই তিনটিই কেমন দুরন্ত, তোমাকে এইখানে বসেই দেখাচ্ছি—

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বৃদ্ধ মুখখানির এক বিচিত্র ভঙ্গী করিতেই একটা তীক্ষ্ণ স্বর নির্গত হইয়া গেল ; মনে হইল তাঁহার কণ্ঠ দিয়া বাঁশীর একটা কর্কশ সুর সশব্দে বাহির হইল।

কিরণপদ পর্য্যন্ত চমকিয়া উঠিলেন ; কোনও মানুষের মুখের শীষ যে বাঁশীর শব্দকেও অতিক্রম করিয়া এত জোরে বাহির হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত এ ধারণা তাঁহার ছিল না। তিনি স্তব্ধ হইয়া ভাবিলেন, ব্যাপার কি—বৃদ্ধ কি ক্ষেপিয়া গেল ?

কিন্তু পরক্ষণেই পর পর যে কয়টি মূর্ত্তি দ্বারের পরদাটি ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, তাহারা প্রত্যেকেই কিরণপদর পরিচিত এবং দেবীপুরের ষ্টেট সম্পর্কিত নানাবিধ অসাধ্য সাধনে যে অভ্যস্ত, ইহাও কিরণপদর অবিদিত নহে। অকস্মাৎ এভাবে এই স্থানে দেবীপুরের এই ভীতিপ্রদ পালোয়ানগুলিকে বিশিষ্ট ভদ্রবেশে উপস্থিত দেখিয়া কিরণপদ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

পরক্ষণেই অবস্থাটা দিব্য উপলব্ধি করিয়া তিনি যন্ত্রচালিতের মতই টেলিফোনের রিসিভারটির দিকে হাত বাড়াইলেন।

কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে তৎপূর্ব্বেই শক্তিপদর সতর্ক চক্ষুর ইঙ্গিতে আকৃষ্ট হইয়া আগন্তুকদের এক ব্যক্তি ক্ষিপ্র হস্তে রিসিভারটি তুলিয়া লইল।

আর এক ব্যক্তি সঙ্গে সঙ্গে পিছন হইতে কিরণপদর গলাটি এমন আশ্চর্য্য কায়দায় চাপিয়া ধরিল যে, দারোয়ানদিগকে ডাকিবার জন্য যে স্বর কণ্ঠ ঠেলিয়া উঠিতেছিল, তাহা ত রুদ্ধ হইয়া গেলই, উপরোন্ত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ যেন পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত আড়ষ্ট ও অসাড় হইয়া পড়িল!

পরক্ষণে শক্তিপদ তাহার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন, —বুঝতে পারছ বোধ হয়, গলার নলিটে ভেঙে দেওয়া আর একটা ঝাঁকুনির ওয়াস্তা; প্রাণে বেঁচে থাকবে, কিন্তু কথা আর মুখ দিয়ে ফুটবে না কোনো দিন!

অতি কষ্টে আড়ষ্ট দুইখানি হাত কেনো রকমে যুক্ত করিয়া কিরণপদ জানাইলেন, আমি মাপ চাইচি, কর্ত্তারাজা!

শক্তিপদ কহিলেন,—এখন তাহলে মানছ যে, শক্তিপদ রায় যেখানে যায়, সেই জায়গাটাই দেবীপুর হয়; আর তার যে কথা তাই কায?

ঘাড়টি নাড়িবার সামর্থটুকুও তখন কিরণপদর নাই, চক্ষুর দৃষ্টিতে সে ঐ দুইটি কথাই মানিয়া লইলেন।

শক্তিপদ পুনরায় কহিলেন,—এখন তোমাকে মারা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া সমান; তার চেয়ে তোমাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই—তোমার মান ইজ্জত ঠাট ঠমক সমস্তই বজায় রেখে, শুধু একখানা হাত তোমার গলার কাছে

তোলা থাকবে—যাতে ইচ্ছে করলেই চেপে ধরতে পারি। রাজী ?

কিরণপদ পূর্ব্ববৎ কোন প্রকারে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

শক্তিপদ কহিলেন,—হাত নামাও।

অমনই তাহার পিছনের লোকটি হাত দুইখানি কিরণপদর কণ্ঠ হইতে সরাইয়া লইল। কিন্তু সে স্থানত্যাগ করিল না, সতর্ক ভাবেই কিরণপদর পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল।

মুক্তির পর একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া জড়িত স্বরে কিরণপদ কহিলেন,—জল।

কিরণপদর সম্মুখেই টেবলের উপর সুদৃশ্য কলিং-বেলটি সতর্ক শক্তিপদ নিজের এক্তিয়ারেই রাখিয়াছিলেন, এখন নিজেই তাহার কলটি ঘুরাইয়া দিলেন। ক্রীং ক্রীং শব্দে সেটি মুখর হইয়া উঠিল।

শক্তিপদ কহিলেন,—কিন্তু হুঁসিয়ার! ফের যদি গোলমাল বাধাবার চেষ্টা কর, তাহলে সব রাস্তাই বন্ধ হবে জেনো।

কিরণপদ কহিলেন,—আমি আর টুঁ শব্দটিও করব না কর্ত্তা রাজা, যা আপনি বলবেন—

পর্দ্দা ঠেলিয়া উর্দ্দীপরা উড়িয়া বেয়ারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সসম্ভ্রমে হাত দুইখানি কপালে তুলিল।

শক্তিপদ কহিলেন,—খাবার জল—

বেহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল এবং একটু পরেই রূপার গ্লাসে সুবাসিত পানীয় জল লইয়া প্রবেশ করিল।

এক নিশ্বাসে জলটুকু নিঃশেষ করিয়া কিরণপদ গ্লাসটি বেয়ারার হাতে দিয়া কহিলেন,—যাও।

শক্তিপদ কহিলেন,—শোনো। তোমার অবস্থা আমি সব জানি। লাখ টাকার ওপর বাজার দেনা তোমার, কারবার রাখতে হলে এখনও লাখ তিনেক টাকার দরকার। কিন্তু টাকা যোগাড় করবার সব রাস্তাই তোমার বন্ধ হয়ে গেছে। ষ্টেটের মাসোহারাই এখন তোমার সম্বল। একটি পয়সাও তুমি আমাকে দাওনি, কিন্তু দলিলে লেখা থাকলেও, আমি মাসোহারা তোমার বন্ধ করেছি?

কিরণপদ কহিলেন,—না। একটি দিনেরও এদিক ওদিক হয়নি মাসোহারা পেতে।

শক্তিপদ কহিলেন,—এই কারবার যদি আমার হাতে পড়তো, এ থেকে আর একটা ষ্টেট গড়ে তুলতে পারতুম।

কিরণপদ কহিলেন,—আমার দুর্ভাগ্য, শেষ রক্ষা করতে পারলুম না।

শক্তিপদ দৃঢ়স্বরে কহিলেন,—রায় কোম্পানীর নামে যখন কারবার, তখন তাকে রক্ষা করতেই হবে। এখন আমার যা ব্যবস্থা শোন,—যে টাকা তোমার কাছে হাওলাত বাবদ পাওনা,

সেই টাকাতে কারবার আমি কিনে নিচ্ছি। এখন থেকে এর মালিক আমি। তবে তোমাকে একবারে বঞ্চিত করব না, ওয়ার্কিং পার্টনার হয়ে তুমি থাকবে, আর নেট মুনফার চার আনা অংশ পাবে।

কিরণপদ মৃদুস্বরে কহিলেন,—দেনার কি হবে ?

শক্তিপদ কহিলেন,—দেনাও তোমার কম নয়, লাখটাকার ওপর। কারবার যখন নিচ্ছি, ওটা শুধতেই হবে। তবে তোমার মাসোহারা থেকে ঐ বাবদে আর্দ্ধেকটা কেটে নেওয়া হবে—দেনাটা শোধ না-হওয়া পর্য্যন্ত। তেমনি, আজ পর্য্যন্ত তোমার বাইরে যা পাওনা, সরঞ্জামী খরচ বাদ দিয়ে সেটা তোমাকেই দেওয়া যাবে।

কিরণপদ কহিল,—আর যে টাকাটা কারবারে লাগাতে হবে—

শক্তিপদ কহিলেন,—সে ভাবনা ত তোমার নয়, টাকা যোগাব আমি ; তা সে দশ বিশ লাখ থেকে ক্রোর টাকা হলেও পরোয়া কি!

কিরণপদর স্তিমিত দুইটি চক্ষু পুনরায় ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শক্তিপদ বক্রদৃষ্টিতে তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই, বাইরে থেকে লোকে জানবে তুমিই

আফিসের সব—অর্থাৎ এখন যেমন আছে; লোকের কাছে তোমার ইজ্জত আমি খাটো হতে দেব না। কিন্তু ভেতরে টাকাকড়ির ব্যাপারে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকবে আমারই লোক। বাইরে সে তোমাকে উপরওয়ালার মত শ্রদ্ধা সম্মান করবে, কিন্তু সব কাজেই তোমাকে তার মত নিয়ে চলতে হবে। রাজী?

কিরণপদ কহিল,—আর রাজী না হয়েই বা উপায় কি?

শক্তিপদ কহিলেন,—দলিল আমার তৈরী, ফোন করে আমার য়্যাটর্নীকে এই খানেই ডাকছি, কালই রেজেষ্টারী হবে। কিন্তু এবারও তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এর পর যেন গোল না বাধে।

কিন্তু ইহার পরে দীননাথের ব্যাপার লইয়া পুনরায় যে গোলযোগ বাধে, তাহার বিবরণ দীননাথের বাড়ীতে সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণপ্রিয়ার প্রেম-সাগরে সাঁতার দিতে গিয়া যে দুর্দ্দশা, মলজীর হইয়াছিল, কিরণপদ মলজীর অবসন্ন দেহটাকে অবলম্বন করিয়া সেই সাগরে নামিয়া কিছুকাল পূর্ণোদ্যমে নাচাকুঁদা ও মাতামাতি করিলেও শেষটা তাহাকেও মলজীর মত নির্জ্জীব হইয়া এলাইয়া পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু

তাহার অদৃষ্টক্রমে ঠিক এই সময় নাটকীয় ঘটনার মত শক্তি-
পদর সংযোগ সহসা তাহাকে চাঙ্গা করিয়া দিল এবং কোথা
হইতে কি হইল তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই অবাক
হইয়া গেল !

তৃতীয় পর্ব

এক

মলজী এখনও নিলুয়ার উদ্যান-ভবনে কৃষ্ণপ্রিয়ার আশ্রিত হইয়াই আছে। তবে এখানে কৃষ্ণপ্রিয়ার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভাগ্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বাগানের দিকে নীচের তালায় একখানা ঘরে তাহাকে নামিতে হইয়াছে। সেইখানেই তাহার নূতন নীড়টি কৃষ্ণপ্রিয়া নিজের পরিকল্পনায় রচনা করিয়া দিয়াছে। ঘরে ঢুকিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে, ঋজু ঋজু জানালার দিকে সুন্দর একখানি পালঙ্ক, তাহার উপর গদী পাতা পুরু বিছানা, উপরে সাদা সুতুঙ্কির আস্তরণ, চারিদিকে ছোট বড় আকারের কতিপয় ঝালর দেওয়া বালিস; উপরে নেটের মশারী। অন্যদিকে একখানি সুন্দর ছোট টেবল, তাহার উপরেই গোলাকার একখানা মুকুর, পার্শ্বে একটা ছোট আলমারি, তাহার ভিতরে নানাবিধ সৌখীন জিনিস। টেবলের একধারে দোয়াতদানি, কলম, প্যাড। টেবল এবং শয্যার মধ্যস্থলে একখানা মারবেল পাথরের মাঝারী রকমের টেবল, তাহার চারিধারে চারিখানি কেদারা; দেওয়ালে রাম সীতা, কৃষ্ণরাধা, বস্ত্রহরণ, কালীয় দমন, কংশবধ, গড়ুর, হনুমানজী প্রভৃতি পৌরাণিক বিবিধ তসবীর টাঙ্গানো; একটা র‍্যাকের উপর কয়েকটা ষ্টীল ট্রাঙ্ক,

স্যুটকেস ও হাত-বাক্স সাজানো। দেওয়ালে সেট্ টমাসের একটা বড় ঘড়ি। দরজা ও জানালাগুলিতে জাপানী ছিটের পরদা, দ্বারের দিকে খানিক অংশ আবৃত করিয়া একখানা পুরু মৃজাপুরী গালিচা পাতা। ঘরের বাহিরে দরদালানটিও প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভারে সুসজ্জিত। ইহারই একদিকে শেঠজীর পূজা অর্চ্চনার স্থানটিও সুরক্ষিত। বাহিরে মারবেল পাথরের খোলা চৌতারা, নীচেই সৌখীন সৌখীন টবে দেশী বিদেশী নানাবিধ ফুলের বাহার।

এই চৌতারাটিই এখন মলজীর চিত্তে সান্ত্বনা দেয়। এই স্থানটিতেই বসিয়া সে তাহার অতীত জীবনের বিচ্ছিন্ন সূত্র-গুলি যোজনা করিতে প্রয়াস পায় এবং প্রায়ই গভীর রাত্রিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া এই স্থানে আসিয়া বসে; অদূরবর্ত্তী দ্বিত্রলের দীপালোকে উদ্ভাসিত কক্ষ হইতে কৃষ্ণপ্রিয়ার গীত-লহরী বায়ুতরঙ্গে ভাসিয়া আসিয়া তাহার চিত্তে কত চিন্তার সৃষ্টি করে! এই স্বতন্ত্র মহলটি মলজীই সুষ্ঠুভাবে নির্ম্মাণ করাইয়াছিল; তখন তাহার উদ্দেশ্য ছিল, যদি এই উদ্যান-ভবনে কোনও সাধু-সন্ত আসেন, এই অংশেই থাকিবেন। কিন্তু তাহার পর ঘটনার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে আজ তাহাকেই এই স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। দ্বিত্রলের যে শ্রেষ্ঠ অংশে তাহার গৌরবান্বিত জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ অতিবাহিত

হইয়াছে, কত নিদর্শনই সেখানে জড়াইয়া আছে; কৃষ্ণপ্রিয়ার কলহাস্য, তাহার কণ্ঠ নিসৃত গীতের উচ্ছ্বাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে সুপরিচিত স্থলে সে স্বর্গ রচনা করিয়াছিল, আজ সেখানে তাহার প্রবেশাধিকারও নাই! কৃষ্ণপ্রিয়াকে পার্শ্বে রাখিয়া কত বিচিত্র ভঙ্গীর কত প্রকার আলেখ্যই সে প্রস্তুত করাইয়াছিল, দ্বিত্রলে উঠিবার সোপানশ্রেণী হইতে সুসজ্জিত হল ও ঘরগুলির সর্ব্বত্রই তাহার কত সমাবেশই দেখা যাইত,—চিত্রে কৃষ্ণপ্রিয়ার সহিত মলজীর কত রকমের প্রকাশ তাহার প্রচুর অর্থব্যয় সার্থক করিয়া দিত। কিন্তু এমনই আশ্চর্য্য যে, কিরণশশীর প্রথমাবির্ভাবের পূর্ব্বেই কৃষ্ণপ্রিয়ার পরামর্শে সে স্বহস্তেই ছবিগুলি খুলিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু গুপ্তস্থান হইতে সেগুলি আর প্রকাশ্য স্থানে আসে নাই, কেমন করিয়া যে রাতারাতিই সেগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা সে কল্পনা করিতেও পারে না! কৃষ্ণপ্রিয়া বলে,—চোরে লইয়া গিয়াছে। এখনও কৃষ্ণপ্রিয়া কচিত কখনও তাহাকে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আশ্বাস দেয়,—ভেবনা মলজী, মনে কর এটা তোমার তপস্যা চলেছে। এতকাল ধরে রূপ আর রূপিয়া নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ, কিছু দিন না হয় সাধন-ভজনই করলে। এর ফল ফলবেই; জান ত, সবুরে মেওয়া ফলে; অন্ধকারের পর আবার

আলো আসে; অমাবস্তের পরই পূর্ণিমা হাসে; তবে ধৈর্য্য চাই।

মলজী গম্ভীর মুখ খানা প্রসন্ন করিয়া বলিত,—তুমি লোককে দেখিয়েছি কি, হামি লোকের দিল খুসীতে ভরপুর হইয়ে যায় জী! দিন রোজ খালি এক ঘণ্টার ওয়াস্তে হামি লোক শুধু তুমি লোকের দর্শন চায় কৃষ্ণা বিবি।

কৃষ্ণা তৎক্ষণাৎ মুখ খানা ঘুরাইয়া জবাব দিত,—সে প্রত্যাশা তুমি ক'রনা শেঠজী, কিরণবাবুর সামনে আমি কিছুতেই তোমার ঘরে দেখা দিতে আসতে পারব না; তুমিও এজন্যে যেন পীড়াপীড়ি কর না বা ঘাবড়িয়ো না, শুধু সবুর করে থাক। আমীর থেকে ফকির হতে কটা বছরই বা তোমার লেগেছিল মলজী! বড় জোর তিনটে। কিরণবাবুও এরই ভেতরে দেউলে খাতায় নাম লেখাবে নিশ্চয়ই। তোমার তবু মোকাম ছিল, আর এখনো ভুঁড়ি আছে, ওর তাও নেই। তার পরই দেখবে, তোমার এই ঘরে কিরণবাবুর ডেরা পড়েছে, আর তোমার [illegible]য়গা হয়েছে আবার সাবেক ঘরে। এখন শুধু সবুর মলজী, স[illegible]!

এতদিন মলজী সবুর করিয়াই নীচের এই আস্তানায় পড়িয়া কোনও রকমে দিন কাটাইতেছি! কৃষ্ণপ্রিয়া তাহার সকল খরচই যোগায়, শুধু তাহার নিজের খরচই বা কেন, অন্য দিকেও তাহাকে নজর রাখিতে হইয়াছে। এই বাগান বাড়ীর পরিচর্য্যা ও

পরিদর্শনের জন্য কৃষ্ণপ্রিয়া মলজীর মাসিক পারিশ্রমিকের হার শত মুদ্রা স্থির করিয়া দিয়াছে এবং এই শত মুদ্রা প্রতিমাসে কিরণপদকেই দাখিল করিতে হয়। কৃষ্ণপ্রিয়া তাহা হইতে প্রতিমাসে পঞ্চাশটি টাকা রাজপুতানার বিকানীর ষ্টেটে মলজীর স্ত্রী বীরাবাঈর নামে মনিঅর্ডার করিয়া পাঠাইয়া দেয়। মনি-অর্ডারের কুপন খানি যথাসময় সে মলজীর হাতে দিয়া বলে,—সইটি তোমার প্রিয়ার ত? দেখে ফাইলে গিঁথে রাখো।

মলজীর দুই চক্ষু তখন জলে ডব ডবিয়া উঠে, চক্ষুর উপর ভাসিয়া থাকে—এক খানা পাথরের তৈরী ছোট খাটো বাড়ী, ক্ষুদ্র আঙ্গিনা, বাঁধানো কূয়া, জর্ণমন্দির, হৃষ্টপুষ্ট এক নারী মূর্ত্তি—বসন্তের গুটিকা চিহ্নিত তাহার শ্যাম-কর্কশ মুখখানি এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ার অবাঞ্ছিত মুখ!

মধ্যে কিরণপদর যখন পড়ি-পড়ি অবস্থা, চারিদিকে দেনার বিভীষিকা; পাওনাদারদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে সে যখন অতি সন্তর্পণে গা ঢাকা দিয়া বেড়াইতেছিল, তখন মলজী নিজের অতীত অবস্থার সহিত এ সমস্ত মিলাইয়া ভাবিত,—বাবুজীর আমিরী আখিরী হয়ে এসেছে, খতম হতে আর দেরী কত?

কৃষ্ণপ্রিয়া ও বুঝিতেছিল, তালপুকুরের জলে পাঁক দেখা দিয়েছে, এখন আর ঘড়া ডুবে না, কিছুদিন পরে ঘটির কাষ ও থাকিবে না।

৬

অজানা অতিথি

হঠাৎ একদিন মলজীর ঘরে আসিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—বাবুর ব্যাপারটা কি রকম বুঝছ মলজী?

মলজী হাসিয়া বলিল,—হামাকে কেন পুছ্ছ, তুমি লোক কুছু জানে না? আরে জী, য়্যায়সা হাল হামার ভি হোয়িয়েছিল।

কৃষ্ণা কহিল,—আমিও তাই মেলাচ্ছি, তোমার সেই দিনকার অবস্থার সঙ্গে বাবুর আজকের অবস্থাটা। [illegible]বর সমান মনে হচ্ছে। লুকোচুরি ভাঁড়াভাড়ি। বাবুর খোঁজে এখানে পর্য্যন্ত লোকের আনাগোনা, আর মুখ খানা যেন শুখিয়ে আমসি।

মলজী কহিল,—আরে জী, হামি লোক সাধন ভজন ক্যায়সা চালিয়েছি,—হোবেক না!

কৃষ্ণা কহিল,—আর চুপ করে থাকা ঠিক নয়, শেষে না একবারে ফাঁকে পড়ি। তিন মাস কিছু দেয় নি,—তুমি চুপি চুপি ওর আপিসের খবরটা নাও দেখি। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে খবর নেবে, যেন জানতে না পারে যে, আমি তোমাকে ওর পেছনে লাগিয়েছি।

কিন্তু ইহার পরে কিরণপদ সে টাল সামলাইয়া লইলেন। বাজারে বাইরে যে দেনা ছিল, তাহার সমস্ত টাকাটা শক্তিপদর নিকট পাইয়া, এককালীন সমস্ত টাকা পরিশোধ করায়—পাওনাদাররা অতি মাত্রায় পুলকিত ও চমৎকৃত হইয়া যে

টাকাটা ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহাতে কিরণপদ কৃষ্ণার সমস্ত দেনা রোকশোধ করিয়া এখানেও বিস্ময়ের শিহরণ তুলিল।

মলজী হাল ছাড়িয়া দিয়া কৃষ্ণাকে জানাইল,—বাবুজী সামলিয়েছে, মালুম হচ্ছে, নয়া মহাজন খুঁজে নিয়েছে।

কৃষ্ণা কহিল,—তা বলে তুমি যেন ছেড়ে দিয়ে না মলজী, সন্ধান রেখো ব্যাপার খানা কি! বাবুজী আমাকে ওর কারবারের হালচাল কিছুই বলে না, এতকাল আমি চুপ করেছিলুম, কিন্তু এবার জানা দরকার হয়েছে। হাজার হোক বিদেশী বাবু তো, বিশ্বাস কি!

কিছু দিন নির্ঝঞ্ঝাট ও নিরুপদ্রবেই চলিল। তাহার পর দীননাথকে উপলক্ষ করিয়া মহীপতির সহিত কিরণপদর মিতালী এবং একটা মোটা রকমের প্রাপ্তির আশায় কিরণপদ পুকুর চুরির ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল! ইদানীং আয় তাহার খুবই কমিয়া গিয়াছিল। মাসোহারার টাকার অর্দ্ধেকটা দেনায় যায়, কারবারের মুনফার সিকি অংশ ছয় মাস অন্তর হিসাব করিয়া যাহা তাহার প্রাপ্য হয়, তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। ইদানীং কারবারের অবস্থাও মন্দা হইয়া পড়িয়াছিল। অথচ, কিরণপদ বরাবর রাজার হালে কাল কাটাইয়া আসিয়াছে, যেখানে এক টাকা খরচ করিবার কথা, সেখানে সে নির্ব্বিচারে এক মুঠো টাকা ছড়াইয়া দিয়াছে। এখন চারিদিকে বাধাবাধি, কারবারের ক্যাস হইতে

একটি টাকাও লইবার সামর্থ্য তাহার নাই। এদিকে কর্ত্তা রাজার কড়া হুকুম। ঠিক এই সময় মহীপতি বাবুর বয়স্ত ভজহরির মধ্যস্থতায় কিরণপদর সহিত তাহার পরিচয় এবং অল্পদিনেই সে পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। দীননাথের প্রতি মহীপতির তখন প্রচণ্ড আক্রোশ। মহীপতি বুঝিয়াছিল, দীননাথের যাহা কিছু লপর চপড়, রায় কোম্পানীকে মুরুব্বী ধরিয়া। সেই মুরুব্বীকে হাত করিয়া দীননাথকে মাত করিবার যে চক্রান্তের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে।

কিন্তু মহীপতি রায় কোম্পানীর পূর্ব্ব ইতিহাস জানিত না, দেবীপুরের রাজকন্যাটির সহিত যে কিরণপদর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ একটা রহিয়াছে বা কিরণপদ দেবীপুরের রায় বংশেরই একজন, মহীপতি কিরণপদর মুখেও তাহা শুনে নাই। এ বিষয়ে কিরণপদ খুবই চাপা ছিল এবং সম্ভবতঃ এ সম্বন্ধে কোনও উদ্দেশ্য তাহার থাকিবে। সে যে দেবীপুর ষ্টেটের সংস্রবে একজন 'কুমার' এবং বংশমর্য্যাদায় একজন উঁচুদরের অভিজা[illegible] ইহা সে কোনও দিন প্রকাশও করে নাই বা কোনও [illegible] এ জন্য কোনও প্রকার গর্ব্ব বোধও করে নাই। পক্ষান্তরে মহীপতির সহিত অল্প দিনের আলাপ-পরিচয়ের মধ্যে কিরণপদও জানিবার সুযোগ পায় নাই যে, রাজকন্যা কল্যাণীর সহিত তাহার বন্ধুটির বিবাহের কথা পাকা হইয়া গিয়াছে কিম্বা বাকড়ায় দেবীপুর রাজ্যের

অজানা অতিথি

রাজকবি সকন্তা উপস্থিত হইয়া একটা চাঞ্চল্য তুলিয়াছে। মহীপতি এ সকল কথা উহ্য রাখিয়া দীননাথের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে জব্দ করিবার জন্য কিরণপদর শরণাপন্ন হইয়াছিল।

দুই

মলজী রীতিমত আগ্রহ সহকারেই কিরণপদর পিছু লইয়াছিল। মহীপতির সহিত তাহার মিশামিশির কিছু কিছু সংবাদও সে শীঘ্রই সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। এবং সে সংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণাকে দাখিল করিল।

কৃষ্ণা একদা গভীর রাত্রিতে কিরণপদর পরিত্যক্ত জামা সার্চ্চ করিয়া কয়েক খানি চিঠি পাইল এবং সেই চিঠিগুলি পড়িয়া বুঝিল—একটা কিছু গোলমাল চলিয়াছে। কিরণপদ তখন নিদ্রিত, সেঁ কিছুই জানিল না। এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণাকে সে তাহার অতীত জীবন ও কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোনও কথাই বলে নাই। কৃষ্ণার সহিত আলাপের সময় শুধু নিজের [illegible] এই পরিচয় দিয়াছিল যে, মাত্র লাখ টাকা ক্যাপিটেল লইয়া কলিকাতায় সে এমন একটা কারবার ফাঁদিয়াছে—বড় বড় বিদেশী মার্চ্চেণ্ট আফিস-গুলো যাহার সহিত টক্কর দিতে গিয়া হিমসীম খায়। চিঠি হইতে কৃষ্ণা বাকড়া ষ্টেটের নূতন জমিদারটির সম্বন্ধেও কিছু কিছু অস্পষ্ট আভাস পাইল। সমস্ত তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিবার জন্য কৃষ্ণার কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠিল।

এদিকে কিরণপদও তখন বিষম ফাঁফরে পড়িয়াছে। একটা ঝোঁকের মাথায় সে কেঁচো খুলিবার জন্য নরম মাটির উপর

কোদালের কোপ দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কেঁচোর বদলে যে সাপ বাহির হইবে, তাহা সে কল্পনাও করে নাই। ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র দীননাথের বাড়ীতে দেবীপুর ষ্টেটের স্থবির সিংহটি যে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহা সে কেমন করিয়া জানিবে? আর, বৃদ্ধের নাতনীটি যে ইতিমধ্যেই এমন বাকপটু হইয়া উঠিয়াছে যে, জেরায় তাহাকে নাস্তানাবুদ করিয়া দিবে—সে পরিচয়টুকু পাইবার সুযোগ কি তাহার অদৃষ্টে কোনও দিন ঘটিয়াছে?

পরের ঝকি লইয়া আবার যে এই ভাবে শক্তিপদর সহিত তাহাকে বোঝাপড়া করিতে হইবে, আর একটা গোলযোগের উৎপত্তি তাহার বর্ত্তমান অবস্থাটাকে জটিল করিয়া দিবে, ইহা কিরণপদর অনভিপ্রেত হইলেও, নিজের মান ও মুখ রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে অকুতোভয়েই কোমর বাঁধিতে হইল। তবে তাহার পক্ষে সুরাহা এইটুকু যে, দীননাথ তাহাকে জেরা ত করিলই না, তাহার বিরুদ্ধে আরোপিত এমন গুরুতর অভিযোগটি খণ্ডন করিবারও কোনও চেষ্টা তাহার তরফ হইতে প্রকাশ পাইল না। তথাপি শেষ রক্ষার জন্য এখন তাহার কি প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা!

উক্ত ঘটনার পর বাকড়ার প্রাসাদে আবার যে পরামর্শ সভা বসিল, তাহাতে উভয়েই উভয়কে দোষী করিল।

কিরণপদ কহিলেন,—এত সব কাণ্ড করে বসেছ, আমার কাছে চেপে রেখেছিলে কেন?

মহীপতি কহিল,—তুমি যে দেবীপুরের এক কুমার, আমাকে সে কথা বল নি কেন? তাহলে কি আমি কিছু চেপে রাখতুম?

ভজহরি দাঁত বাহির করিয়া কহিল,—এ যেন সেই দুর্য্যোধনের ঘোষ যাত্রা হ'ল! এমন হার হুজুরের আর কখনো হয় নি।

মহীপতি কহিল,—ঘটনাটা এমন উল্টে গেল যে, এখন মুখ দেখানো ভার।

কিরণপদ কহিলেন,—তোমার এমন বিশেষ কি ক্ষতি বল! যদি শেষ রক্ষা না করতে পারি, আমারই সর্ব্বনাশ! তুমি ত জান্ না, আমি এখন সব দিক দিয়ে ঐ বুড়ো সাইলকটার মুঠোর ভেতরে। যদি এটা মিথ্যে সাব্যস্ত হয়, আমাকে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

মহিপতি কহিল,—কুছপরোয়া নেই। তুমি উঠে পড়ে লাগ, যাতে তোমার কথাটাই খাঁটি হয় তাই কর, এর জন্যে টাকার জন্যে ভেব না।

কিরণপদ কথাটা স্থির হইয়াই শুনিলেন। তাহার পর মহীপতির দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তোমার উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট করেই বল, এখন তুমি কি চাও?

মহীপতি কহিল,—শুনবে? প্রথম—দীননাথকে জাহান্নমে

দেওয়া ; ওর সম্বন্ধে যে কথাগুলো বলেছ, যাতে সেগুলো ঠিক বলে প্রতিপন্ন করা যায়।

—তারপর ?

—তারপর ? খুলে বলতে হবে ? বাবা যে সম্বন্ধটা করে গেছেন, সেটা যাতে পাকা হয়ে যায় অর্থাৎ—

—থাক্‌, বুঝিছি। কিন্তু আজকের ঘটনার পরও মনে হয়—সম্বন্ধটা এখনো আস্ত আছে, ভাঙেনি ?

—না। ভেঙেছে আমারই ভুলে ; আর দীনর দিকে ওদের যে মোহটা পড়েছিল, তোমার কথায় সেটাও ভেঙেছে। সম্বন্ধটা ঠিক বজায় আছে।

—তুমি এখনো আশা রাখ ?

—রাজকন্যার জন্য আমার সর্ব্বস্ব পণ। ওকে আমি চাই, যেমন করেই হোক।

—কিন্তু রাজকন্যা যে তোমাকে চায়, তা ত মনে হয় না।

—সীতা রাবণকে চায়নি, কিন্তু রাবণ চেয়েছিল সীতাকে। আমিও তেমনি ওকে পেতে চাই, যদি এর জন্যে ধনে প্রাণে মরি, তাতেও কুচপরোয়া নেই।

—কিন্তু ভুলে যাচ্ছ তুমি, এমনি করে যাকে পেতে চাও তুমি, সে দেবীপুরের রাজকন্যা—শক্তিপদ রায়ের নাতনী।

—তা জানি। বংশ পরম্পরায় ওদের সঙ্গে এ-বংশের

ঝগড়াই চলে আসছে শুনেছি, অনেক লাঠালাঠি খুন খারাবিও হয়ে গেছে; শেষে আমার বাবাই মিলনগ্রন্থী পরাতে চেয়েছিলেন। সেটা না হয় ফের কেঁচে গণ্ডূষ করা যাবে উল্টো রাস্তা ধরে।

কিরণপদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মহীপতির আরক্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন,—তাহলে এই তোমার শেষ কথা?

মহীপতি কহিল,—শেষ কথা। আমার পেছনে কেউ নেই; মা, বোন, ভাই—কেউ না। বাবা সারা জীবন ধরে শুধু করছেন সঞ্চয়। দেনা নেই, দায় নেই, কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, আছে শুধু প্রচুর আয় আর তার ওপর বসে আমি।

কিরণপদ কহিল,—তাহলে এই ঝঞ্ঝাট ডেকে আনবার কি দরকার? নাই বা এলো দেবীপুরের রাজকন্যা, অমন কত রাজকন্যাকে তুমি ত ইচ্ছে করলেই আনতে পার?

মহীপতি দৃঢ়স্বরে কহিল,—না-না, তাতে সুখ নেই। আমার মাথার চাকাটা আজ উল্টো দিকে ঘুরে গেছে, আমি আর সে মানুষ নই; একটা নতুন নেশা আমাকে মাতিয়ে দিয়েছে—সেটা হচ্ছে ঐ রাজকন্যা—ওকে আমার চাই। এ ছাড়া আর কোনো কথা আমার নেই।

কিরণপদ কহিল,—এই যদি তোমার সঙ্কল্প, তাহলে আজই কলকাতায় চলো, সেখানে এ সম্বন্ধে চূড়োন্ত পরামর্শ করা যাবে।

মহীপতি কহিল,—তাতে আমার আপত্তি নেই। আমার শেষ কথা এই, যদি এখানে থাকতে হয়, সত্যিকার জমিদার হয়ে থাকবো, আর ঐ দীননাথের মত চুনোপুঁটিগুলোকে তাঁবেদারের সামীল করে দুপায়ে থেঁতলাবো।

তিন

কৃষ্ণা সেদিন কিরণপদকে কহিল,—আমাকে সব লুকিয়ে কি লাভ তোমার হচ্ছে শুনি ?

কিরণপদ অবাক ! এ মেয়েটা বলে কি ? না হয়, তার চেহারা খানাই চমৎকার, গলাটিও পরিস্কার, দিব্যি গায়, বেশ কায়দায় কথা কয়, কিন্তু বিষয়-আসয়ের কথায় ঠোক্কর দিতে চায় কি হিসেবে ? কহিল,—এ কথা বলবার মানে ?

কৃষ্ণা মুচকি হাসিয়া কহিল,—মনের ভেতর যে সব কথা লুকিয়ে রাখ, ঘুমের ঘোরে সেই সবই বলে ফেল। সব ত বুঝতে পারি না, কিন্তু যে সব কথা শুনি, তাতে এইটুকু বুঝতে পারি যে, তুমি খুবই ভাবনায় পড়েছ।

বিস্ময়ের স্থরে কিরণপদ কহিলেন,—বল কি ?

কৃষ্ণা কহিল,—তোমার গুপ্ত কথাগুলো আগাগোড়া সব বলে ফেল দেখি, তাতে তোমার ভালোই হবে।

—কি হবে ?

—বুদ্ধি খুলে যাবে। নিজে ভেবে যা ঠিক করতে পারছ না, উকীল-ব্যারিষ্টাররাও হার মেনে যায়, হয় ত আমাদের কাছেই তার হদিস পেতে পার।

—বল কি গো !

—একটা পরামর্শ নিয়েই দেখ না গো !

কিরণপদ কহিল,—আচ্ছা, তাই হোক। যা থাকে বরাতে, সব কথাই আজ তোমাকে খুলে বলছি, কিছুই চেপে রাখব না, আমার জীবনের সব কথাই তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, সত্যি এ যেন একটা গল্প।

অতঃপর দীর্ঘ দুইটি ঘণ্টা ধরিয়া কিরণপদ তাহার জীবন কথা আগাগোড়া সমস্তই কৃষ্ণার নিকট প্রকাশ করিল এবং সেই সঙ্গে পারিপার্শ্বিক ঘটনাসূত্রে দীননাথ, মহীপতি ও রাজকন্যা কল্যাণীর প্রসঙ্গও শুনাইয়া দিল।

কৃষ্ণা সমস্ত শুনিয়া কহিল,—কি সর্ব্বনাশ! তুমি এই সব কথা এত দিন চেপে রেখেছ! আগে যদি বলতে, এমন করে পস্তাতে হ'ত না! বুড়ো তোমাকে অমন করে বেকুব বানিয়ে কাজ হাসিল করে গেলো! ছ্যা! কলকেতা কি সত্যি সত্যি মগের মুলুক? তোমার আফিসে গোড়া থেকে নিশ্চয়ই বুড়োর চর ছিল, যাকে বলে গোয়েন্দা।

কিরণপদ কহিল,—তোমার বুদ্ধিতে ধার আছে বটে! ঠিক ধরেছ, আমারও এই ধারণা। কিন্তু কে যে চর, তাকে ধরতে পারি নি।

কৃষ্ণা কহিল,—তার জন্যে ভাবনা নেই, আমি ধরে দেব।

কিরণপদ কহিল,—সে ব্যবস্থা পরে। এখন দীননাথকে নিয়ে যে মুস্কিলে পড়েছি, সেইটিই হয়েছে মস্ত ভাবনার কথা।

কৃষ্ণা কহিল,—কিন্তু সব খুলে না বললে কি করে ওর কিনারা হবে? সোনাগাছির ব্যাপারটা তুমি যে চেপে যাচ্ছ।

কিরণপদ কহিল,—চেপে যাচ্ছি এই জন্যে যে, সেটা খুলে বললে—তোমার মুখখানা পাছে ভার হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণা কহিল,—আমি কচি খুকী নই, আর নেকাও হইনি। কৃষ্ণাপ্রিয়া ছাড়া দুনিয়ায় তোমার যে আর কোনো প্রিয়া থাকতে নেই, এমন একটা অসম্ভব কল্পনাকে আমি মনের ভেতর পুষে রাখিনি। তুমি সব খুলে বলে যাও, আমার তাতে মোটেই হিংসে হবে না।

কিরণপদ কহিল,—তাহলে তোমার কাছে লুকোবো না, মাঝে মাঝে বন্ধুরা আমাকে সোনাগাছিতে একটা আড্ডায় নিয়ে যেত। সেখানে প্রায়ই মাইফেল হত, আর মাইফেলের দিন না গিয়ে আমার উপায় ছিল না। যার ঘরে আড্ডা বসত, তার নামও হচ্ছে কৃষ্ণা। তবে তুমি কৃষ্ণাপ্রিয়া আর সে হচ্ছে কৃষ্ণভামিনী। মোটা সোটা চেহারা, বেঁটে সেটে মানুষ, যেন গুজরাটি হাতী; তবে গলাখানি খুব মিষ্টি।

কৃষ্ণার মুখে বিরক্তির ছায়া মোটেই পড়িল না, বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল,—আমি তাকে জানি। সেও আমাকে চেনে। সোনাগাছির বাজারটার গায়েই বাড়ী ত?

—ঠিক। তাহলে কৃষ্ণার সঙ্গে মিতালী আছে বল! যাক্, যা

অজানা অতিথি

বলছিলুম শোনো। তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে দিনটা শনিবার। কৃষ্ণভামিনীর ঘরে মাইফেলের বৈঠক তখনও ঠিক বসে নি, বসাবার যোগাড়-যন্ত্র হচ্ছে। ঘর খানা খুব বড়, এক দিকের বারান্দা রাস্তার ওপরেই, অপরদিকের বারন্দাটা ঘরের সামনে একটা খোল্লা দালানের পরেই। সেই বারন্দা ঐ বাড়ীটার আর সব ঘরে যাবার রাস্তা বললেও চলে। বাড়ীটা ঐ পাড়ার আর সব বাড়ীর চেয়ে একটু উঁচু ধরণের। এ বাড়ীতে যারা থাকে, তারা কেউ বারান্দায় ব'সে বা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে লোক ডাকে না! সকলেই গান বাজনা নিয়ে থাকে, মজুরো করে, থিয়েটার প্লে করে। রাস্তার যে-সে এখানে বড় একটা ঘেঁসে না।

হঠাং ভেতরের দিকে বারান্দায় একটা লোককে হঠাৎ নেমে যেতে দেখে আমরা চমকে উঠলুম। আমরা মানে, আমি নিজে আর আমার কজন বন্ধু, তার মধ্যে আফিসেরও একজন ছিল। যে লোকটীকে দেখে চমকে উঠেছিলুম, সে আর কেউ নয়— দীননাথ। চমকাবার কারণ এই যে, তাকে আমরা বরাবরই স্বভাব চরিত্রের দিক দিয়ে খুব ভালো বলেই জানতুম। আর সে নিজেও যখন তখন স্বভাব চরিত্রের দোহাই দিয়ে যেসব কথা বলত—সেগুলো আমাদের গায়ে কাঁটার মত বিঁধতো। কাযেই এই লোকটাকে এক হিসেবে যেমন ভালবাসতুম, আর এক দিক

দিয়ে তেমনি ওকে অপছন্দও করতুম। সেখানে দীননাথকে দেখেই আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম তার নাম ধরে, যাতে না পালায়; দুজন তখনই বেরিয়ে গেল বাইরে তাকে ধরবার জন্যে। একটু পরেই দীননাথকে নিয়ে হাজীর।

জিজ্ঞাসা করলুম,—কি গো সাধুপুরুষ, এখানে কি মনে করে?

দীননাথ যে একটু ঘাবড়েছে, সেটা বেশ অনুভব করলুম। কিন্তু কথায় তা কিছু বোঝা গেল না, সে বেশ সহজ ভাবেই বললে,—একটা কাযে এসেছিলুম।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলুম,—কাযটা কি শুনতে পাই না?

দীননাথ বললে,—না। তবে যা ভাবছেন সে দিক দিয়ে কিছু নয়।

আমাদের দলের একজন বললে,—ঠাকুর ঘরে কে, না—আমি কলা খাইনে! আর একজন বললে,—একেই বলে ভক্ত বিটেল, ভণ্ডামী এবার ভাঙ্গলো।

দীননাথ শুধু তার দিকে একটিবার কটমট করে চাইলে, কিন্তু কিছু তাকে বললে না! তার পরই আমাকে বললে,—আপনার আফিসে গিয়েছিলুম, জুটের কায আমার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আপনাদের টাকাটা ফেরৎ দিতে হচ্ছে। আপনাকে না পেয়ে ক্যাসে জমা দিয়ে এসেছি।

কৃষ্ণভামিনী এ পর্য্যন্ত চুপ করেই ছিল, এই সময় সে হেসে

বললে,—টাকাটা এইখানে আনলেই পারতেন, তা'হলে সদ্গতি হ'ত।

দীননাথ সে কথার কোন উত্তর দিল না বা আমাকেও আর কোন কথা বললে না। হন হন করে চলে গেল। আমার তখন কেমন একটা কৌতূহল হল। কৃষ্ণভামিনী জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপার কি! ছেলেটা কিন্তু আনাড়ী, অর্থাৎ যাকে বলে বুনো।

আমি তাকে তার কথাটা খুলে বলে অনুরোধ করলুম,—গান একটু পরে হবে। একবার তোমাকে কষ্ট করে উঠতে হবে, ওদিকে গিয়ে খবর নিতে হবে—কার ঘরে ও গিয়েছিল।

আধ ঘণ্টাটাক পরে কৃষ্ণভামিনী ফিরে এল। মুখে তার হাসি ধরে না। বললে,—ওরে বাবা, রীতিমত রোম্যান্স! আঠারো উনিশ বছরের একটা ছুঁড়ি আজই সদ্য এসে ওদিকের একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। সন্ধান করে করে ঠিক ধরলুম কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেই ছুঁড়ি আমার মুখের ওপর বললে,—আমার লাভার, আমার ঘরেই এসেছিল, এর জন্যে আপনি গোয়েন্দা-গিরি করতে এসেছেন কেন বলুন ত?

বুঝতেই পারছ, মেয়েটাকে নিজের চোখে একটিবার দেখবার জন্য তখন ভারি আগ্রহ হল। চেষ্টাও খুব করা গেল; কিন্তু সে কিছুতেই দেখা দিলে না বা কথা কইলে না দরজায় খিল দিয়ে চুপ করে রইলো।

পরদিন সন্ধ্যে হতে না হইতেই আমরা আবার গিয়ে হাজির ঐ বাড়ীতে। কিন্তু আমাকে দেখেই কৃষ্ণভামিনী হাসিমুখে বললে,—পাখী উড়ে গেছে, ঘরখানি পড়ে আছে। বাড়ীউলীর একটা মাসের ভাড়ার টাকাটাই লাভ।

এর পরেই মহীপতি বাবুর সঙ্গে আমাদের প্যাক্ট হয়ে গেল। দীননাথকে রসিদটা আর দেওয়া হল না, সেও সেই থেকে আর আফিস মুখো হয়নি। তার পরের ঘটনা সবই ত শুনেছ!

কৃষ্ণা কহিল,—তাহলে সেই রাত্তিরের ঐ তিলের মতন ব্যাপারটাকে তালের মতন করে দীননাথের ওপর চাপিয়ে দিয়েছ—এই ত?

কিরণপদ স্বীকার করিল,—তাই। এ ভিন্ন আর উপায় খুঁজে পাইনি।

কৃষ্ণা কহিল,—বেশ, আমি তোমার কেসটা হাতে নিলুম। নামের মিলটা কাযে লাগবে। এখন দরকার কেষ্টোর সঙ্গে পরামর্শ, আর একটা রফা করা। খরচ পত্র [illegible]াবে কে?

কিরণপদ কহিল,—মহীপতি নিজে।

কৃষ্ণা কহিল,—তাহলে কালই তাঁকে এখানে নেমন্তন্ন কর। তাঁর সঙ্গেও কথা বলা দরকার। ভাল কথা—আমার সম্বন্ধে কোন কথা তার সঙ্গে তোমার হয়েছে?

কিরণপদ কহিল,—পাগল! এসব ব্যাপারে আমি খুবই চাপা।

কৃষ্ণা কহিল,—তা জানি! তাহলে শোনো, নেমন্তন্ন করে দরকার নেই। তুমি শুধু তাকে বলবে, যে সব কাযের ভার গোয়েন্দাকে দেওয়া যায় না—আইন ছাপিয়ে করতে হয়, সেই-সব কাযের ভার আমি নিয়ে থাকি। কাক চিল জানবে না, কোনো কেলেঙ্কারী হবে না, অথচ কায ঠিক হাসিল হয়ে যাবে। এই সূত্রেই যেন তোমার সঙ্গে আমার জানা শোনা বন্ধুত্ব, কতকগুলো প্রশংসাপত্রও শুনিয়ে দেবে; তারপর লোকটাকে খাইয়ে দাইয়ে তোয়াজ করা যাবে, তাতেই আমাদের সুবিধে। আর তোমার অবস্থা যা শুনলুম, সুবিধের নয় মোটেই, কেউ লেগেছে পেছুনে, খুব সাবধানে চলতে হবে, এ সময় বাকড়া ষ্টেটের জমানো যখের ধনের কিছু অংশ যদি আমাদের হাতে আসে মন্দ কি!

কিরণপদ কৃষ্ণার কমনীয় মুখখানির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া কহিলেন,—ধনও আসবে, ধনীও ধসবে; শেষে একুল ওকুল দুকুলই না যায়!

কৃষ্ণা কিরণপদর মুখের উপর তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—গেলেই বা, তোমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধিটা কি শুনি! আগে বাঁচতে হবে তোমাকে, তারই কল কাটি হবেন ঐ ধনীটি, বুঝলে?

কিরণপদ কহিল,—আমি এবার ক্লান্ত, হাল ছেড়ে দিলুম তোমার হাতে; শেষ রক্ষা তুমিই কর।

কৃষ্ণা নিরুত্তরেই উঠিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রসাধন সারিয়া সে প্রকাণ্ড মুকুরখানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের মনেই বলিতেছিল,—না, দেরী আছে; জোয়ার এখনও কানায় কানায় ধরে রেখেছি, ভাঁটার সাধ্য কি এর ত্রিসীমায় আসে! যখন জোয়ার একান্তই গড়াবে, মহীপতিও ততদিনে মাত হয়ে যাবে।

চার

কৃষ্ণা একদিন মলজীকে বলিয়াছিল, কিরণপদর অজ্ঞাতে তাহার খোঁজ খবর যেন সে লয় ও সবিশেষ তাহাকে জানায়। দুর্দ্দশার টালটি সামলাইয়া কিরণপদ আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল বটে, কিন্তু মলজীর গোয়েন্দাগিরি সমান ভাবেই চলিয়া আসিতে ছিল। কিরণপদর হাড় হদ্দ জানিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল, কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করিতেও পারিয়াছিল এবং বিস্তারিত জানিতে তাহার কৌতূহল ক্রমশঃই প্রবল হইতেছিল।

যেদিন কিরণপদ কৃষ্ণার নিকট তাহার জীবনের রুদ্ধ দ্বারটী একেবারে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, মলজী সে সময় লাইব্রেরীর ভিতর বসিয়া মাড়বারী ভাষায় ছাপা তুলসীদাসের রামায়ণ পড়িতেছিল। নীচের তালায় সুবৃহৎ লাইব্রেরী—এই মলজীর পরিকল্পনাতেই নির্ম্মিত ও সজ্জিত। তাহার পার্শ্বেই সুসজ্জিত ড্রইং রুম। কৃষ্ণার সহিত এমন অসময়ে কিরণপদর এই ঘরে অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি মলজীকে সচকিত করিয়া তুলিল এবং একটা প্রচণ্ড কৌতূহল বক্ষে রুদ্ধ করিয়া সে স্থাণুবৎ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

প্রায় দুইটী ঘণ্টা কথোপকথনের পর যখন তাহারা উঠিয়া গেল, তখন ড্রয়িং রুম বিজলীর আলোকে উদ্ভাষিত। সন্ধ্যার

প্রায়ান্ধকারে অনেকটা পূর্ব্বেই মলজী লাইব্রেরীর ভিতর ঢুকিয়া-এবং সন্ধ্যা অতীত হইলেও অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরটির ভিতর বসিয়া রুদ্ধনিশ্বাসে সে কিরণপদর কথিত উপাখ্যান শুনিল এবং সুযোগ মত অন্যের অগোচরেই আস্তে আস্তে বাহির হইয়া নিজের আস্তানায় চলিয়া গেল।

পরদিনও সে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া লাইব্রেরীর ভিতর অন্যের অগোচরে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর দুই মূর্ত্তি ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করিল। মলজী আস্তে আস্তে উঠিয়া জানালার পরদাটা একটু ফাঁক করিয়া ড্রয়িং রুমটির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিতেই বুঝিল, কিরণপদর সঙ্গীটি বাকড়া ষ্টেটের জমিদার মহীপতি বাবু ভিন্ন অন্য কেহ নহে।

মলজী উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

মহীপতি কহিল,—একটা মেয়ে যে মুরুব্বীর মত পুরুষকে পরামর্শ দিতে পারে, একথা কখনই বিশ্বাস করতুম না দাদা, যদি আপনাদের রাজকন্যার বুদ্ধির দৌড়টা নিজের চোখে না দেখতুম।

মহীপতি কিরণপদ অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, যদিও কিরণপদ নানা অত্যাচারের ভিতরেও বিবিধ প্রক্রিয়ায় দেহটাকে যৌবনের সীমার মধ্যেই ধরিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি ঘনিষ্ঠতা

ক্রমশঃ নিবিড় হইলে মহীপতিই বুঝিয়াছিল, কিরণপদকে কোনও প্রকারেই বয়স্য দলভুক্ত করা চলে না! তাই সম্প্রতি সে তাহার অনুজত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিরণপদও ইহাতে সায় দিয়াছে।

মহীপতির কথা শুনিয়া কিরণপদ মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন,—মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়নি ত কখনো, এদের নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিও করনি; প্রথমেই তোমার চোখে পড়েছে দেবীপুরের রাজকন্যা; সে আবার শক্তিপদর নাতনী; মানব সভ্যতার সংগ্রহে যত রকমের ঘানী আছে, বুড়ো তার প্রত্যেক-টাতে ওকে ঘুরিয়ে ওস্তাদ করে দিয়েছে। প্রথমেই তার সঙ্গে তোমার আলাপ, তা আবার অনেকটা বকলমের মত; কাযেই তোমার তাক লাগবার কথা। কিন্তু আজ যার সঙ্গে তোমার আলাপ হবে, সে আর একটা আলাদা স্তরের মেয়ে। খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তা হলেই বুঝবে, এমন মেয়ে কস্মিনকালেও কোথাও দেখনি। অথচ, মনের ভেতর কোনো গলদই ওর নেই, যেন গঙ্গাজল।

কিরণপদ কহিল,—আমার বরাবরের ধারণা কি জান দাদা, এই মেয়ে জাতটার ভেতরে তেজ বলে কিছু নাই। একটু বেশী আস্কারা দিলেই মাথার ওপর উঠে নাচে, আবার একটু জোরে দাবড়ানী দিলেই পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদে।

—এমন ধারণাটা তোমার মনে হয়েছিল কি সূত্রে? নজীর কিছু আছে নাকি?

—নিশ্চয়ই; নজীর ছাড়া আমি জোর করে কিছুই বলি না। নিজের মাকে অবশ্য ভাল ক'রে বুঝতে পারিনি, কেননা, তিনি আমাকে পৃথিবীর আলোকে ছেড়ে দিয়েই রোগশয্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় আমার ভার যিনি নেন, তিনি কিন্তু বাবার মাথায় উঠে নাচতেন, আবার এক সময় দাবড়ানীর. চোটে তফাতে ছিটকে পড়ে কি তাঁর দুর্গতি! তার পর কেবলই শুনিছি, কাকুতি, মিনতি আর কান্না; এখন ভাবি আর হাসি।

—ব্যাপারটা খুলেই বল না—শুনি।

—শোনবার মত কিছু নয় দাদা, কোনো চিহ্নই তার নেই, বাবাই সেখানে ফুলষ্টপ দিয়ে গেছেন।

এই সময় বাহিরে পদ শব্দ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে চুড়ির রিনিঝিনি ধ্বনির সঙ্গে পরদাটি ঈষদুন্ম হইল এবং কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল কৃষ্ণপ্রিয়া।

আজ তাহার পরিচ্ছদ বা অলঙ্কারে বিশেষ প্রাচুর্য্য নাই, কিন্তু পারিপাট্য কি চমৎকার! তাহার পরণে মারহাট্টি প্যাটার্ণের একখানা কালো রঙ্গের সাড়ী, ব্লাউসটিও সাড়ীর উপযোগী এবং অতিশয় টাইট; মাথার সুদীর্ঘ কেশপাশ সাড়ীর সহিত

মিশিয়া পীঠটি ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। গলায় একছড়া সরু পালিস করা সোনার হার,—সাড়ীর সংস্পর্শে তাহার প্রভা যেন মেঘের কোলে বিজলীর মত ঠিকরাইয়া পড়িতেছে; হাতে চুড়ি ও অতিশয় সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত ব্রেসলেট; বিভিন্ন অংশে কয়েকটি হীরার ব্রুচ।

ঘরে প্রবেশ করিয়াই কৃষ্ণা হাত দুইটি তুলিয়া উভয়ের উদ্দেশে নমস্কার করিল।

কিরণপদ ও মহীপতি উভয়েই কৃষ্ণাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া প্রতিনমস্কার জানাইল।

কৃষ্ণা মহীপতির ঠিক সামনের সোফাটির কাছে গিয়া কহিল,—বসুন, বসুন; আমাকে লজ্জা দেবেন না।

প্রায় এক সঙ্গেই সকলে বসিল।

মহীপতি মুগ্ধ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখখানির দিকে চাহিয়া মনে মনে বুঝি বিচার করিতেছিল,—কাহার আকর্ষণ অধিক; রাজ-কন্যার, না তাহারই সম্মুখে উপবিষ্টা এই মহিলাটির!

কৃষ্ণা ইচ্ছা করিয়াই তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইয়াছিল, কিন্তু মনের দৃষ্টি দিয়া সে এই তরুণ অভ্যাগতটিকে ভাল করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ তাহার দুইটি চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি মহীপতির প্রফুল্ল মুখখানির উপর নিবদ্ধ হইবামাত্র অত্যন্ত অপ্রতিভের মতই মহীপতি

মুখখানি নীচু করিয়া দিল। চোখোচোখি হইবামাত্রই কৃষ্ণার দৃপ্ত দৃষ্টিতে তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি যেন ক্ষণকালের জন্য নষ্প্রভ হইয়া গেল।

কৃষ্ণা কহিল,—কিরণ বাবুর কাছে আপনার সম্বন্ধে সমস্তই শুনিছি। আপনার কেসটা খুবই সিরিয়াস।

মহীপতি একটু হাসিয়া কহিল,—আমিও শুনিছি, আপনি নাকি সিরিয়াসকে সহজ করতে পারেন। সেই জন্যই কেস্‌টা আপনার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি।

কৃষ্ণাও হাসিয়া কহিল,—যাঁরা হালে পানি না পান, তাঁরাই শেষে এই অবলার দ্বারে ধন্না দেন।

মহীপতি কহিল,—কিরণদার কাছে শুনিছি, আপনি অবলা হয়েও প্রবলা। উনি তার অনেক নজীর দেখিয়েছেন।

কৃষ্ণা কহিল,—উনি স্নেহ করেন, তাই ড়িয়ে বলেছেন। পরের মুখে ঝাল খেয়ে কিছু লাভ নেই, গ নিজে যাচিয়ে দেখুন—অবলার ক্ষমতা কতটুকু।

মহীপতি মৃদু হাসিয়া কহিল,—শিকারী বেড়ালের গোঁফ দেখেই চেনা যায়।

কৃষ্ণা কহিল,—তাই নাকি? কিন্তু আমার মুখে গোঁফের চিহ্ন কি দেখা দিয়েছে?

কিরণপদ কহিল,—কথাটায় আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

পুরুষের প্রতিভা যে সব মেয়েরা অধিকার করে কায চালায়, আজকাল তাদের অনেকেরই গোঁফ বেরোয়। এর নজীর আছে।

কৃষ্ণা কহিল,—আপনি থামুন। আমি বলি, সে সব মেয়েদের উচিত, তখুনি মুখগুলো কষ্টিক ম্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া। আমার মতে ও নজীর প্রশংসার নিদর্শন নয় কিছুতেই।

মহীপতি কহিল,—পুরুষদের প্রতি আপনার এতটা বিদ্বেষের কারণ?

কৃষ্ণা কহিল,—তাহলে আপনি আমার কথাটা ঠিক ধরতেই পারেন নি। বিদ্বেষ কেন হবে? পুরুষের প্রতি পুরুষের যতটা বিদ্বেষ এবং সেটা যতখানি ব্যাপক, মেয়েদের বিদ্বেষও তাদের প্রতি ঠিক ততখানি আপনি বলতে চান? মিছে কথা। পুরুষের সম্বন্ধে আজকাল মেয়েদের যে বিদ্বেষের কথা শোনা যায়, সেটা শুধু মুখের—মনের নয়। মেয়েদের যত বিদ্বেষ মেয়েদেরই ওপর, আর সেটা হচ্ছে আঁতের। এর হাজার নজীর আমি দেখিয়ে দিতে পারি।

কিরণপদ কহিল,—তাহলে কি আপনি বলতে চান, পুরুষদের যত কিছু বিদ্বেষ—

কৃষ্ণা কহিল,—পুরুষদেরই ওপর। হাতে হাতেই তার

প্রমাণ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।—দীননাথ বেচারীর কথাই ধরুন,—খেটে খুটে খাচ্ছিল, দিন বেশ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু দেশের জমিদার নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে, এটা প্রাণে সহ্য হ'ল না। এলো অহেতুকী বিদ্বেষ। প্রবন্ধ লিখে সভায় পড়ে তাকে খাটো করবার চেষ্টা করলে। আগুণ উঠলো অমনি জ্বলে—

কিরণপদ কহিলেন,—বাঃ, খাসা নজীর!

কৃষ্ণা কহিল,—তার পর, মহীপতি বাবু ওসব হেসে উড়িয়ে দিতেই পারতেন। কিন্তু এমনি মজা, কোনো জমিদার প্রজাজাতীয় লোকের খোঁচা কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। ইনিও পারলেন না। তার ওপর, হবু শ্বশুর বাড়ীর লোকের সামনে তাঁকে হেনস্তা, রাজকন্যার সহচরীর টিট্‌কিরী—তাঁকে দিলে তাতিয়ে, বিদ্বেষ উঠলো জেগে। তখন দীননাথ বেচারীকে ধনে-প্রাণে নষ্ট করবার কি চেষ্টা!

কিরণপদ কহিলেন,—বিউটিফুল!

মহীপতি অভিভূতের মতই এই স্পষ্টবাদিনী মেয়েটির সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া তাহার কথাগুলি শুনিতেছিল।

কৃষ্ণা কহিল,—তার পর ধরুন রাজকন্যার কথা। হেসে হেসে দুটি প্রেমিককে নিয়ে দিব্যি খেলাচ্ছিলেন। কিন্তু যেই উঠলো সোনাগাছির বাঈজীর কথা, অমনি মুখখানা হয়ে গেল অন্ধকার, বিদ্বেষ তখুনি বিষের মত তাঁর মনখানা দিলে

বিস্ময়ে। যত তাঁর রাগ গিয়ে পড়ল সোনাগাছির সেই মেয়েটির ওপর—যার গল্প কিরণ বাবু সেখানে সবার সামনে শুনিয়েছিলেন। এখন তিনি শুধু বোঝাপড়া করতে চান—সেই মেয়েটির সঙ্গে।

কিরণপদ কহিল,—আপনি এমন ভাবে কথাগুলি বলছেন, যেন সেখানে নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত দেখেছেন, শুনেছেন; সকলেই যেন আপনার চেনা।

কৃষ্ণা হাসিয়া কহিল,—ঐটুকু জানাই যে আমার পেশা কিরণ বাবু! আসল ব্যাপার যাই হোক না কেন বা আমি যাই বুঝিনা কেন, আপনাদের দুজনের পক্ষ যদি আমাকে নিতে হয়, আমাকে দেখাতে হবে—দীননাথের আর যে সব গুণ থাকনা কেন, স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়ে সে অতি ভয়ানক, সোনাগাছির সেই বাঈজীটার সঙ্গে তার মাখামাখি এতই নিবিড়তম যে, ছাড়াছাড়ির কোনো উপায় নেই। আর, অন্যদিক দিয়ে—মহীপতি বাবুর যে দোষগুলো সবাই দেখে, আসলে সে গুলো দোষ নয়—গুণ; জমিদারী বজায় রাখতে হলে ওগুলো থাকা চাইই। যার স্বভাব চরিত্র সাধুর মত নির্ম্মল, এতটুকু দাগ নেই, তার আবার দোষ কি?

কিরণপদ উল্লাসের সুরে কহিল,—বাঃ! এর ওপর আর কথা নেই।

মহীপতি কহিল,—আমার কেসটা আপনি এত শীগগীর আর এমন সহজেই বুঝেছেন দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। কোনো বড় ব্যারিষ্টারও এভাবে কেসটা মাথায় নিতে পারত কিনা সন্দেহ। যাহোক, এখন কথা এই, আমি আপনার ওপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

কৃষ্ণা কহিল,—আমি যে অবধি শুনিছি, এর ভেতরে যদি আর কোনো কথা লুকোনো না থাকে, আমি আপনার ব্রীফ্ নিতে পারি, আর এই পর্য্যন্ত ভরসা আপনি রাখতে পারেন —শেষ পর্য্যন্ত আপনারই জিত হবে।

মহীপতি উৎফুল্ল হইয়া চুপি চুপি কিরণপদর কানে কানে কিছু বলিতেই কিরণপদ হাসিয়া কৃষ্ণার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন,—ইনি দক্ষিণার কথাটা পাকা করতে চাইছেন।

কৃষ্ণা কহিল,—সেটা চাইব পরে, এর জন্যে ব্যস্ত হবার কি আছে? মূল দক্ষিণা কাজের শেষে, তবে কুঁচোকাঁচা নৈবিদ্যিগুলো সাজাতে যা দরকার হবে—বলব বই কি, এসব বিষয়ে আমার ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই।

মহীপতি কহিল,—তাহলে আগাম কত দেব? একটা কিছু হুকুম করুন—

কৃষ্ণা হাসিয়া কহিল,—যদি, বলি খুচরো বাবদে দশ হাজার টাকার চেক একখানা আগাম চাই?

মহীপতি সহজ কণ্ঠেই কহিল,—বেশ, কাল দশটার ভেতরেই চেক খানা পাঠিয়ে দেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।

এই সময় চাকর আসিয়া সসম্ভ্রমে জানাইল,—খাবার দেওয়া হয়েছে।

কৃষ্ণা কহিল,—অনুগ্রহ করে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, একবার ওপরটায় উঠতে হবে।

কিরণপদ কহিলেন,—কি ব্যাপার বলুন ত?

কৃষ্ণা কহিল,—এই মধুর সন্ধ্যাটি স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে সামান্য একটু মিষ্টিমুখের আয়োজন করা হয়েছে।

মহীপতি কহিল,—কি বিপদ, এ সব কেন? আপনার সঙ্গে আলাপ করে যে আনন্দ পেলুম, মিষ্টি কি এর চেয়েও বেশী তৃপ্তি দিতে পারবে?

কৃষ্ণা তাহার মুখের হাসিটুকু যতদূর সম্ভব মিষ্টতর করিয়া কহিল,—বেশ ত, তার সঙ্গে আলাপটাও না হয় চলবে, গা তুলুন ত!

কিরণপদ কহিলেন,—ইনি আবার চমৎকার গাইতে পারেন, তা বুঝি জান না?

মহীপতি কৃষ্ণার পানে চাহিয়া কহিল,—তাই নাকি! সে সৌভাগ্য যদি হয়, তাহলে না হয় উঠি!

কৃষ্ণা চটুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—আপনি উঠুন ত;

সৌভাগ্য কিম্বা দুর্ভাগ্য, সে বিচার না হয় পরেই করলেন। আসুন।

কৃষ্ণা সর্ব্বাগ্রে উঠিয়া মহীপতির হাতখানি ধরিয়া একটা মৃদুমন্দ ঝাঁকুনি দিল।

মহীপতির মনে হইল, সমস্ত আসবাব পত্র লইয়া সুসজ্জিত সুবৃহৎ হলঘরখানি বন বন করিয়া ঘুরিতেছে!

কিছুক্ষণ পরে লাইব্রেরী ঘরের দ্বারদেশে বিলম্বিত পর্দ্দাটি দুলিয়া উঠিল এবং তাহার পাশ দিয়া বিরক্ত কুটিল একখানা মুখ বাহির হইল; সে মুখ—মলঞ্জীর। ড্রয়িং রুমের আলো তখন নিবিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই অন্ধকারের ভিতরেই মলঞ্জীর দুই চক্ষু বুঝি জ্বলিতেছিল; সেই অবস্থায় তাহার মুখ দিয়া একটা অস্ফুটস্বর বাহির হইল,—আচ্ছা!

পাঁচ

মহীপতির পক্ষ সমর্থন করিয়া কৃষ্ণা তাহার কায আরম্ভ করিয়াছে। কাযের সংস্রবে প্রায়ই ইহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং সেই সূত্রে এক একদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যায়। কিরণপদর অনুপস্থিতিতেও আলোচনা এখন বন্ধ থাকে না। কোনও কোনও দিন একাই মহীপতি টালিগঞ্জ হইতে লিলুয়ায় উপনীত হয় এবং উপরের সুসজ্জিত ঘরে কৃষ্ণার সহিত তাহার কত কথাই চলে। কৃষ্ণার গান না শুনিলে মহীপতির মন উসখুস করিতে থাকে, কৃষ্ণা তাহা বুঝিতে পারে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে বাছিয়া বাছিয়া সময়োচিত গান গাহিতেই হয়।

একদা সুযোগ বুঝিয়া কৃষ্ণা মোটরে চড়িয়া মহীপতির টালিগঞ্জের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে চমৎকৃত করিয়া দিল। বিশেষ ব্যস্ততার সহিত সে জানাইল,—একটা কথা জানবার প্রয়োজন হয়েছে, তাই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে আসতে হল।

মহীপতি কৃতার্থ হইয়া কহিল,—আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার দর্শন পেলুম। আপনি জানেন না, আপনাকে দেখবার জন্ত আমার সমস্ত অন্তরটা কি রকম উদগ্রীব হয়ে থাকে।

কৃষ্ণা মুখে দুষ্টুমির হাসি আনিয়া জানিতে চাহিল,—আপনার অন্তরটারও তাহলে দৃষ্টিশক্তি আছে বলুন ?

মহীপতি উত্তর দিল,—অন্তরের দেখাই ত সত্যিকারের দেখা। আপনাকে আমি অন্তর দিয়েই দেখেছি।

কৃষ্ণা মুচকি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আর রাজকন্যাকে ?

মহীপতির মুখখানা উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিল, কহিল,—সেটা এখন নাই বা বললুম। জেবরা নামে একটা সুন্দর জানোয়ার আছে, বোধ হয় আলিপুরের পশুশালায় দেখেছেন। কেউ তাকে পোষ মানাতে পারে না। তবুও শিকারীর আনন্দ কি জানেন, তাকে ধরে বেড়ার ভেতরে রেখে। শুধুই সে তার যাতনাদায়ক নাচুনি দেখবে, দেখে আহ্লাদে হাততালি দিয়ে বলবে—কেমন! রাজকন্যার সম্বন্ধে আমার আকাঙ্ক্ষাও তাই।

কৃষ্ণা হাসিয়া প্রশ্ন করিল,—তাতে লাভ ?

মহীপতি উত্তর দিল—লাভ-লোকসানের কথা এখন নয়—হিসেব-নিকেশের পর।

কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই এই হিসাব-নিকাশের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

একটা প্রীতি ভোজকে উপলক্ষ করিয়া দেবীপুররাজের সারকুলার রোডের প্রাসাদে এই হিসাব নিকাশের অপ্রত্যাশিত

তলব সকল পক্ষকেই চমৎকৃত করিয়া দিল। অথচ, আহ্বানের ধারাটি এমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, কোন পক্ষেরই অবহেলা করিবার উপায় ছিল না।

দীননাথ এই উপলক্ষে যে পত্র পাইয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—যে অপ্রীতিকর ঘটনা একদা তোমার বাড়ীতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তোমার জীবনকে বিষময় করিয়া রাখিয়াছে, আত্মমর্য্যাদার দিক দিয়া তাহার একটা নিষ্পত্তির প্রয়োজন। একটা প্রীতিভোজনকে উপলক্ষ করিয়াই এই আয়োজন করা হইয়াছে। সে দিন তোমার বাড়ীতে—বহু প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও—উপস্থিত অন্ন আমরা ত্যাগ করিতে পারি নাই। আশা করি, আমাদের এই আয়োজনটিও তোমার সাহচর্য্যে পরিপূর্ণ হইবার অবকাশ পাইবে। —শক্তিপদ রায়।

মহীপতির নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র তাহার দেশের বাড়ী ঘুরিয়া টালিগঞ্জের বাসায় পহুছাইল—

কৌতুকসূত্রে যে অনর্থ ঘটিয়াছিল, আমার বয়স ও সম্পর্ক কল্পনা করিয়া তুমি নিশ্চয়ই উপেক্ষা করিবে। ঐ অপ্রীতিকর ঘটনার পর একটা মিলনান্ত প্রীতিভোজকে উপলক্ষ করিয়া ভবিষ্যত আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে বিকশিত করিবার আয়োজন হইয়াছে। তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে যোগদান না করিলে বুঝিব, কৌতুকপ্রিয় বৃদ্ধকে ক্ষমা করিতে পার নাই। আসা চাই-ই।—শক্তিপদ রায়।

কিরণশশী আফিসের ঠিকানায় এইরূপ এক পত্র পাইল—

এখানে যে অপ্রীতিকর ঘটনাগুলি অসম্পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। রায় কোম্পানীর সম্বন্ধে দীননাথ বেচারীর বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ তুমি করিয়াছ, সে যদিও তাহার খণ্ডন করিতে চাহে নাই, তোমার উচিত অবিলম্বে সাক্ষ্য সাবুদ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা। অপরাধ করিয়া নীরব থাকিলে নিস্তার পাওয়া যায় না, দীননাথও পাইবে না। সর্ব্বসমক্ষে তাহার স্বরূপ মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া সমাজকে সতর্ক করিয়া দেওয়া উচিত। রায় কোম্পানীর দায়িত্বও ইহার সহিত জড়িত। সুতরাং এক প্রীতিভোজ উপলক্ষ করিয়া প্রীতিপূর্ণভাবেই এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়, ইহাই আমার ইচ্ছা। সেই রাত্রির অকুস্থলের সাক্ষীদের লইয়া তুমি উপস্থিত হইবে ও প্রীতিভোজে যোগদান করিবে। আশীর্ব্বাদক—শক্তিপদ রায়।

দীননাথ স্থির করিয়াছিল যে, বণিকদের সহিত আর কোন সম্পর্কই রাখিবে না—দেবীপুরের রাজপরিবারের সহিতও নহে। কিন্তু সেদিনের অবস্থা এবং বৃদ্ধ রাজা ও তরুণী রাজকন্যার আন্তরিকতার কথা স্মরণ করিয়া, এ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। তবে সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, তাহার বিরুদ্ধে অতবড় গুরুতর অভিযোগ থাকিতে এবং

তাহার খণ্ডনের কোনও ব্যবস্থা তাহার পক্ষ হইতে না হওয়া সত্ত্বেও রাজবাড়ীর প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে তাহার মত চরিত্র-হীনের আহ্বান হইল কেন?

মহীপতি পত্র পাইয়াই টেলিফোনে কিরণপদকে আহ্বান করিল। কিরণপদ তাহাকে জানাইল,—আমিও রাজার এক পত্র পইয়াছি। যাই হোক, সন্ধ্যার পর পত্র লইয়া লিলুয়ার বাগানে চলিয়া আইস, তথায় পরামর্শ হইবে।

শুধু এই কয়জনই নয়, বাকড়া মিলের ম্যানেজার মিষ্টার হুইলারও রাজা বাহাদুরের নিকট হইতে উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিনটিতে যথাসময় তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে উপস্থিত হইবার এক নিমন্ত্রণ পত্র পাইলেন। সে পত্রের মর্ম্ম এই যে, ইতিপূর্ব্বে বাকড়ায় দীননাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল, মিষ্টার হুইলার যাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী এবং ব্যাপারটির সহিত পরোক্ষভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এই উপলক্ষে দেবীপুর আবাসে প্রীতিভোজেরও কিঞ্চিৎ আয়োজন করা হইয়াছে। মিষ্টার হুইলার অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাতে যোগদান করিলে রাজাবাহাদুর বিশেষ প্রীতিলাভ করিবেন।

নিমন্ত্রণ পত্র ব্যতীত সরকারীভাবে মিষ্টার হুইলারের নিকট দেবীপুরের দপ্তর হইতে আর একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছিল।

সে পত্রখানির মর্ম্ম এই যে, বাকড়া মিলের জুট ডিপার্টমেন্টের কনট্রাক্ট সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, দেবীপুর সরকারের তরফ হইতে তাহার প্রতিবাদ উঠিলে উক্ত মিলের বহুদর্শী অধ্যক্ষ এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, ডাইরেক্টারদের মিটিংএ বিষয়টি তুলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত তিনি জ্ঞাপন করিবেন। দেবীপুর সরকার সাগ্রহেই উক্ত সিদ্ধান্তটুকু জানিবার প্রতীক্ষা করিতেছেন, সুতরাং মিলের কর্ত্তৃপক্ষ তথা অধ্যক্ষ অতি সত্বর যেন এ সম্বন্ধে অবহিত হন।

ছয়

দেবীপুর রাজের কলিকাতার বাড়ীর গদীঘরটিও রাজসভার মতই সুবিস্তৃত ও সুসজ্জিত। প্রবেশ করিলেই তাহার শোভা ও সমৃদ্ধি এই রাজবংশের বিপুল বৈভব ও আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। দেউড়ীতে শাস্ত্রীরা বন্দুকে কিরিচ লাগাইয়া পাহারা দিতেছিল, গদীঘরের প্রত্যেক দ্বারে এক একজন সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন থাকিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছিল।

অপূর্ব্ব প্রীতিভোজনটি উপলক্ষ করিয়া তথাকথিত আমন্ত্রিতগণ সকলেই উপস্থিত।

গদীঘরের ঠিক পার্শ্বেই একখানি ঘরে কিরণপদর সযত্ন সংগৃহীত কতিপয় সাক্ষীও বৃদ্ধ রাজার আহ্বানের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

কিরণপদ, মহীপতি, দীননাথ, হুইলার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। অভ্যাগতগণের প্রতি যথোচিত অভ্যর্থনা ও আদর আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই হয় নাই।

অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে পাশাপাশি দুইখানি বৈচিত্র্যময় আসনে বৃদ্ধ রাজা শক্তিপদ ও তাঁহার তরুণী পৌত্রী কল্যাণী বসিয়াছিল। কল্যাণীর পরিচ্ছদেও আজ বৈচিত্র্য ছিল; দেবীপুরের ভাবী-উত্তরাধিকারিণীর উপযুক্ত মহার্ঘ্য পরিচ্ছদেই সে আজ সজ্জিত

হইয়াছে। শক্তিপদ তুষারশুভ্র ক্ষৌর বস্ত্র, পিরাণ ও অনুরূপ উত্তরীয় আজ পরিধান করিয়াছেন; উপরোক্ত গলায় একছড়া মুক্তার মালা দুলিতেছে। তাঁহার মুখখানি প্রসন্ন বলিয়া মনে হইলেও, কল্যাণীর মুখখানি তাহার তুলনায় আজ যেন অতিশয় গম্ভীর।

মহীপতি ও কিরণপদ জানিত যে, প্রীতিভোজের অন্তরালে একটা অপ্রীতিকর ব্যাপার প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং তাহাতে দীননাথের মুখখানা আজ মাটীর সহিত মিশিয়া যাইবে। কিন্তু দীননাথ ইহার কিছুই জানিত না। রাজসভায় প্রবেশ করিয়া এবং যাথাচিত অভ্যর্থিত হইবার পর পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া সে একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল। অথচ, স্থান ত্যাগ করিবার কোনও উপায় তাহার পক্ষে তখন ছিল না। রাজাই সর্ব্বপ্রথম এই বলিয়া সভার কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন,—একটা কৌতুক কল্পনা করেই আমার এই আনন্দময়ী নাতনীটিকে নিয়ে বাকড়ায় যাই, কিন্তু তারপর ঘটনাচক্রে সেটা এমনই বেঁকে দাঁড়ায় যে একটা রীতিমত নাটক তৈরী হয়েছে বললেই চলে। তাতে যারা জড়িয়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছে বা মন-গুমরে আছে, নাটকের যে দৃশ্যগুলো এখনো সকলের চোখে না পড়ায় রহস্য হয়েই রয়েছে, আজকের প্রীতিভোজের আগেই সেগুলো প্রকাশ করে সবাইকে খুসী করে দেওয়াটা আমি কর্ত্তব্য বলেই মনে করি। আর,

এই বিশ্বাসও রাখি যে, এতে কারুর মনে অভিমান ওঠবার মত কিছু নেই; কেন না, এটাও যে একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয়, একথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর তিনি কিরণপদর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—তুমি সে দিন দীননাথ বাবুর সম্বন্ধে যে অপবাদ দিয়েছ, যদিও দীননাথ বাবু সেটা কাটাবার জন্ত চেষ্টা করতে অনিচ্ছুক, কিন্তু তাতেই জোর করে তাঁর সম্বন্ধে কোনো ধারণা আমরা পোষণ করতে পারি না। আমি নানা দিক দিয়ে ওঁর সম্বন্ধে তদন্ত করে যা জেনেছি, তাতে তোমার চাপানো ঐ অপবাদটা ওঁর চরিত্রের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাচ্ছে না। এ একটা মস্ত সমস্যা। এখন আমি তোমাকে শেষ অনুরোধ করছি, হয় তুমি ঐ কথাটা প্রত্যাহার কর, না-হয় সাক্ষীসাবুদ দিয়ে প্রমাণ করে দাও যে তোমার ঐ কথাটা সত্যি।

কিরণপদ উঠিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল,—আমার কথাটা যে সত্যি, শুধু মুখের কথা নয়—সাক্ষীর মুখ দিয়েই আমি তা প্রমান করে দেব।

রাজা প্রশ্ন করিলেন,—তোমার সাক্ষী উপস্থিত?

কিরণপদ উত্তর দিলেন,—নিশ্চয়ই। কর্তারাজার হুকুম হলেই আমি তাদের এইখানে এনে উপস্থিত করি।

রাজাবাহাদুর কহিলেন,—আনো। তোমার সাক্ষীর এজাহারটাই আগে হয়ে যাক।

কিরণপদ তাহার জনৈক অনুচরকে ইঙ্গিত করিতেই সে অদূরবর্ত্তী ঘরটির দিকে চলিয়া গেল এবং একটু পরে তাহার সঙ্গে যে সাক্ষীটি সভায় প্রবেশ করিল, অনেকগুলি চক্ষুই তাহার দিকে নিবদ্ধ হইয়া রহিল।

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে কিছুদূর অগ্রবর্ত্তী হইয়া শক্তিপদ ও কল্যাণীকে অভিবাদন জানাইল। রাজাবাহাদুর ও কল্যাণী উভয়েই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটু পরে কল্যাণী অদূরবর্ত্তী দীননাথের দিকে সেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু তাহার মুখে কোনওরূপ চাঞ্চল্যই দেখা গেল না।

রাজাবাহাদুর গম্ভীর হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—কি তোমার নাম?

কৃষ্ণা উত্তর দিল,—শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী।

—নিবাস?

—৩৫নং সোনাগাছি লেন।

—পেসা?

—নাচ, গান এবং রূপের বেসাতি।

—তুমি দীননাথ বাবুকে চেন এবং জান?

—খুব।

—কিসের সম্বন্ধে চেনাশুনা বা জানা?

—(হাসিয়া) সেটা কি এখানে প্রকাশ করা উচিত? আমার পেশা ত আগেই বলেছি।

—কিন্তু তুমি আগুন নিয়ে খেলা করছ, তা জান?

—আগুন নিয়ে খেলা করতেই অদৃষ্টক্রমে আমরা অভ্যস্ত।

—ওঁর সম্বন্ধে আর কিছু বক্তব্য তোমার আছে?

—আমার বলা ত কিছুই এখনো হয় নি। যে টাকা নিয়ে এই ঘটনা—

রাজাবাহাদুর এই সময় সহসা দৃঢ় স্বরে কহিলেন,—টাকার কথা নিয়ে আমি কোনো প্রশ্ন এখানে করব না। তোমার সঙ্গে ওঁর কোনো অবৈধ সম্বন্ধ আছে, এইটুকুই আগে তোমাকে প্রতিপন্ন করতে হবে, এবং খুব সংক্ষেপে।

কৃষ্ণা কহিল,—সম্বন্ধের কথা আমি আগেই বলেছি এবং এখনো বলছি। ওঁর ক্ষমতা থাকে আপত্তি করুন।

রাজাবাহাদুর দীননাথের দিকে চাহিয়া অতঃপর প্রশ্ন করিলেন,—এ একটা মস্ত সমস্যা দীননাথ। ইজ্জত এবং সম্ভ্রমের ওপর আক্রমণ। তোমার কর্ত্তব্য এই অভিযোগ খণ্ডন করা।

দীননাথ কহিল,—আমি কল্পনাও করিনি রাজাবাহাদুর, প্রীতিভোজের নেমন্তন্নর পেছনে যে আমার বিচারের এত বড় একটা আয়োজন করা হয়েছে!

রাজাবাহাদুর কহিলেন,—ঘটনাচক্রে আমাকে এ ব্যবস্থা করতে হয়েছে, যেহেতু এই ঘটনাটার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়েছি। এখন আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করছি দীননাথ, তুমি তার উত্তর দাও। এই মেয়েটি যে সব কথা তোমার বিরুদ্ধে জোর করে বললে, এ সব সত্যি ?

দীননাথ উত্তর দিল,—না।

রাজাবাহাদুর ভ্রূকুটী করিয়া কৃষ্ণার দিকে চাহিতেই সে মুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিল,—আমি এঁকে তিনটি কথা জিজ্ঞাসা করব, অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথা, তার উত্তরেই সমস্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে যাবে।

রাজাবাহাদুর কহিলেন,—করতে পারো, কিন্তু তোমাকে জেরা করবার অধিকারও ওঁর আছে জেনো।

কৃষ্ণা দীননাথের দিকে চাহিয়া কহিল,—আপনি যে খুব সত্যবাদী এ কথা আপনার শত্রুরাও বিশ্বাস করে দীননাথ বাবু, আমিও করি। সত্যের দিকে চেয়েই আপনি আমার কথার উত্তর দিন ; আর কোনো কথা নয়, শুধু যে কথা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর। আপনি বলুন,—এর আগেও আমার সঙ্গে আপনার জানাশোনা হয়েছে কি না ? হ্যাঁ কি না— তাই বলুন।

অভিভূতের মতই দীননাথ উত্তর দিল,—হ্যাঁ।

—৩৫নং সোনাগাছি লেনের বাড়ীতে আপনি গেছেন কি না?

—হ্যাঁ।

—ঐ বাড়ীর দোতালার ফ্লাটে নিশা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে······তারিখে রাত আন্দাজ আটটার সময় আপনার দেখা-সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা হয়েছে কি না?

—হ্যাঁ।

কৃষ্ণা হাসিয়া কহিল,—আপনার সত্যবাদীতায় আমি খুসী হয়েছি। আর আপনাকে কোন কথা আমি জিজ্ঞাসা করে ব্যথা দেব না। এখন এই তিনটি প্রশ্ন আর উত্তর থেকেই রাজাবাহাদুর ব্যাপারটা অনুমান করুন। ঐ মেয়েটিকে উপলক্ষ করেই ওঁর সঙ্গে আমার এই মনান্তর। নইলে ওঁর মত বহুদিনের প্রিয় বন্ধুর মনে আমাকে আজ এ ভাবে দাগা দিতে হত না।

রাজাবাহাদুর কহিলেন,—তুমি এখন থামো। আমি দীননাথকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।—অতঃপর স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দীননাথের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন,—তুমি এই মেয়েটিকে জেরা করবে দীননাথ?

দীননাথ দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—না।

রাজাবাহাদুর কহিলেন,—তাহলে ওর তিনটি কথার উত্তরে তুমি কিছু বলবে?

দীননাথ উত্তর দিল,—ইচ্ছা নেই।

রাজাবাহাদুর কহিলেন,—আত্মরক্ষার অনুরোধেও নয়?

দীননাথ উত্তর দিল,—তার চেয়ে আত্মসমর্পণ আমি সঙ্গতই মনে করি। মূকের উদ্দেশে তর্জ্জন করলেও মূক কখনো মুখর হয় না। শবকে ধরে দাঁড় করিয়ে দিতে পারা যায়, কিন্তু তার কাছ থেকে কোন কথা আদায় করা যায় না।

শক্তিপদ কহিলেন,—কিন্তু তুমি ত মূক নও দীননাথ, আর এখনো শবে পরিণত হওনি। আমার অনুরোধ, আমার বয়সের দিকে চেয়ে তুমি তোমার কথা বলো।

দীননাথ কহিল,—কি বলব! এর আগেও ইনি আমার সঙ্গে দেখা করেছেন, পরিচয় দিয়েছেন, অনেক কিছু অনুরোধও করেছেন। সুতরাং আমাকে ওঁর প্রশ্নে সায় দিতেই হয়েছে। সোনাগাছি লেনের ঐ বাড়ীটিতে আমি যে একদিন গিয়েছি, একথাও সত্যি, আর নিশা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সেখানে দেখা করেছি, তাতেও কোনো ভুল নেই।

এই সময়—এতক্ষণ পরে—এই প্রথম রাজকন্যা কল্যাণী প্রশ্ন করিল,—সে মেয়েটি কে দীননাথ বাবু?

দীননাথ আর্ত্তকণ্ঠে কহিল,—আমাকে এ প্রশ্ন না করলেই সুখী হব।

কল্যাণী কণ্ঠের স্বর একটু তীক্ষ্ণ করিয়াই কহিল,—কিন্তু

এই প্রশ্নের ওপর সমস্ত নির্ভর করছে দীননাথ বাবু; প্রশ্ন যখন উঠেছে, তার মীমাংসা হওয়াও উচিত।

দীননাথ কহিল,—তাহলে এইটুকুই শুনে রাখুন, এক পতনোন্মুখিনী অভাগীকে ফেরাবার জন্যই আমাকে এই প্রথম একটি ঘণ্টার জন্য ঐ নরকে ঢুকতে হয়েছিল।

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা মুচকি হাসিয়া কহিল,—আপনার সত্যনিষ্ঠা যে এবার পা-পিছলে পড়ল দীননাথ বাবু!

কল্যাণী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৃষ্ণার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়াই পুনরায় সে দৃষ্টি দীননাথের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল,—আমাদের শেষ প্রশ্ন দীননাথ বাবু,—সে মেয়েটি কে?

দীননাথ গম্ভীর মুখে উত্তর দিল,—আমার বোন!

এই অপ্রত্যাশিত উত্তর অনেককেই এক নিমেষে স্তব্ধ করিয়া দিল; কাহারও কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল।

কল্যাণী স্থির দৃষ্টিতে দীননাথের মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—বিপথগামিনী কোনো বোন কি আপনার ছিল দীননাথ বাবু? কই, শুনিনি ত!

দীননাথ কহিল,—আমার যা বক্তব্য, শেষ হয়ে গেছে। আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করবেন না।

কৃষ্ণা এই সময় মুচকি হাসিয়া কহিল,—চমৎকার!

কল্যাণী কহিল,—তাহলে আপনার সেই বোনটীকেই

এখানে আনতে হল দেখছি। এ ভিন্ন রহস্য প্রকাশের আর উপায় নেই।

শক্তিপদ সহসা জোর গলায় ডাকিলেন,—পাগলী!

পরক্ষণেই পশ্চাতদিকের দরজার ভেলভেটের পরদাখানি ঠেলিয়া এক সুদর্শনা তরুণী সভায় প্রবেশ করিল এবং শক্তিপদ ও কল্যাণীর উদ্দেশে মাথাটি নোয়াইয়া কল্যাণীর সন্নিধ্যে গিয়া দাঁড়াইল।

সকলের দৃষ্টি এই মেয়েটির দিকেই নিবদ্ধ হইয়া রহিল। দীননাথের মুখে বিস্ময়ের একটা চিহ্ন প[illegible]; কিন্তু মহীপতির মুখ-খানা যেন সেই মুহূর্ত্তে ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গেল। ইহাদের এই পরিবর্ত্তন শক্তিপদ ও কল্যাণীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

শক্তিপদ কহিলেন,—এই মেয়েটি কল্যাণীর কাছে এসে এর সমস্ত কাহিনীটিই বলেছে। কিন্তু তুমি যে এর ভাই, সে কথা স্বীকার করেনি। এই মেয়েটির কথাই কি তুমি বলনি দীননাথ?

দীননাথ কহিল,—সাক্ষী প্রমাণ সবই যখন আপনার হাতে, বিচারের এই অভিনয় করবার কোনো প্রয়োজনই ত ছিল না রাজা বাহাদুর!

শক্তিপদ কহিলেন,—প্রয়োজন নেই! বৃথাই কি তাহলে এই সব আয়োজন? যাক্; যে রহস্য এখনো যবনিকার অন্তরালে রয়েছে, তুমিই সেটা প্রকাশ করে ফেল পাগলী মা! ঘটনার যবনিকাও পড়ে যাক্।

তরুণী কহিল,—তাহলে সকলেই শুনুন, আমার ভাই—ঐ বসে রয়েছেন, বাকড়া এষ্টেটের বর্ত্তমান মালিক—মহামহিম মহীপতি মুখোপাধ্যায়।

মহীপতির মুখখানি নীচের দিকে আরও অবনত হইল। তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের একটি ধ্বনিও বাহির হইল না।

শক্তিপদ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—কি রকম ভাই?

তরুণী কহিল,—তার এক রোমাঞ্চকর ইতিহাস আছে; সে একটা দীর্ঘ কাহিনী। শুনতে হলে খানিকটা সময় যাবে, ধৈর্য্যেরও প্রয়োজন হবে।

রাজা বাহাদুর কহিলেন,—তুমি বল, আমরা সকলেই সে কাহিনী শুনবো। যদি তাতে গলদ আছে বলে কেউ মনে করেন, তিনি নিশ্চয়ই তার প্রতিবাদ করবেন; সেটাও আমাদিগকে শুনতে হবে।

মেয়েটি দৃঢ়স্বরে বলিল,—আমি দীননাথ বাবুর ছাত্রী, আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা বেরুবে না। আপনারা তাহলে গল্পের মতই আমার কাহিনীটি শুনুন।

সাত

অসঙ্কোচে ও মর্ম্মস্পর্শী স্বরে মেয়েটি বলিতে আরম্ভ করিল—কথায় যে বলে—রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়—ঠিক এই দুর্দ্দশাই আমার অভাগিনী মায়ের অদৃষ্টে ঘটেছিল। আমার বাবা, আর আমার মায়ের বাবা, দুজনেই ছিলেন সমান জেদী ; যে যা ধরতেন, তাই না করে ছাড়তেন না। আমার বাবা মস্ত জমিদার, অনেক টাকা, প্রচুর ক্ষমতা, তার ওপর তিনি উঁচু দরের কুলীন ; এই কুলের অহঙ্কার তাঁকে এমনি পেয়ে বসেছিল যে, যাঁরা কুলীন নন, তিনি তাদের বামুন বলেই মনে করতেন না ; 'ভাঙ্গা' বলে তাঁদের মনগুলোও ভেঙ্গে মুচড়ে দিতেন। আমার মায়ের বাবা আর এক জমিদারের পত্তনিদার, অবস্থা স্বচ্ছল, নামডাক খুব ; একটা বিষয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে পেরে উঠতো না, আর ভয় না করে পারতো না ; সে বিষয়টি হচ্ছে মামলাবাজী। এ অঞ্চলে আমার মাতামহের মতন [illegible] দে মামলাবাজের আর জোড়া ছিল না। এই অহঙ্কারে তিনিও কাউকে যেন গ্রাহ্য করতেন না। আবার এমনই মজা, কুলের ব্যাপারে আমার বাবা ছিলেন যতখানি গোঁড়া, মাতামহ ছিলেন তেমনই উদার। তাই তিনি বলতেন, ওটা হচ্ছে ঠিক,—'ঢাল নেই তলোয়ার নেই আছে নিধিরাম সরদার!' কোন দামই ওর নেই, এ যুগে ও অচল।

তাই তিনি নিজে কুলীন হয়েও, সত্যকার গুণী ছেলে দেখেই তাঁর দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের আগে শুধু সন্ধান নিয়েছিলেন, তাঁরা সুব্রাহ্মণ, সুবিদ্বান ও বিত্তবান। ষাট বৎসর বয়সে আমার মাতামহের যে উদারতা ও বিচারবুদ্ধি ছিল, ত্রিশ বৎসর বয়সে আমার বাবা তার ধার দিয়েও যান নি। অথচ, এমনই ভবিতব্যের খেলা, এঁদের মধ্যেই একদিন শ্বশুর জামাই সম্বন্ধটুকু কায়েম হয়ে গেল।

আমারঐ মহীপতি দাদার মাকেই অবশ্য বাবা প্রথমে বিয়ে করেছিলেন। সে বিবাহ দিয়ে যান আমার পিতামহ। তাঁর নজর ছিল আরও চড়া; এমন কুলীনের মেয়ে চাই, আর যাই হোক না কেন, কৌলীন্যে তাঁর কোন দাগদোগ না থাকে। কাযেই কুলবধূ হয়ে যিনি এলেন, নিকষ কুলীনের ছাপটুকু ছাড়া আর সব দিক দিয়েই তিনি ছিলেন নিরেস। বিয়ের বছর কতক পরেই এমন শক্ত রোগে তিনি পড়লেন যে, টাকার জোরে যদিও তাঁকে বাঁচানো গেল, কিন্তু মা-শীতলা তাঁর সর্ব্বাঙ্গে যে চিহ্ন রেখে দিলেন, তা আর মুছলো না। একেত ভাল রূপ ছিল না, তার ওপর এই কাণ্ড! সেই থেকেই দেহটি তাঁর ভেঙ্গে গেল, আর মেজাজটি এমনই চোড়ে উঠলো যে, অতবড় জমিদার বাড়ীতে যে সব আত্মীয় কুটুম্ব আশ্রয় নিয়ে পরিজনের সামীল হয়ে ছিল, তারা সকলে তল্পী তল্পা নিয়ে পালাবার পথ পেলে না। বাবাও

নাকি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। শেষে তাঁর এক মাত্র ছেলে—আমার ঐ দাদাটির ওপর তাঁর সেই মেজাজটুকু সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনি একদিন মা-শীতলার সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য দেবলোকের পথে পাড়ী দিলেন।

বলতে ভুলে গিয়েছি আসল কথাটি! তিনি যখন বেঁচে, আর আমার দাদাটি মাস পাঁচেকের ছেলে—তাঁর কোলটি আলো করে ছিলেন, সেই সময় আমার বাবা এদের নিয়ে হাওয়া বদলাতে কাশী গিয়েছিলেন। আমার মাও সেই সময় মাতামহের সঙ্গে কাশীতেই ছিলেন। বাবা নাকি প্রায়ই দশাশ্বমেধের ঘাটে বেড়াতে বেরুতেন, কোনদিন দাদার মা থাকতেন সঙ্গে, কোনদিন বা থাকতেন না। কিন্তু দাদা কাছে না থাকলে বেড়িয়ে তিনি আনন্দ পেতেন না। কাযেই, মা না এলেও দারোয়ানের কোলে উঠে দাদাকে বাবার সঙ্গে যেতে হত। একদিন হ'ল কি, ঘাটে গিয়ে হঠাৎ দাদা এমনি বাহানা স্থরু করে দিলে ... কার সাধ্যি তাকে থামায়! বাবা পর্য্যন্ত হার মেনে গে...। তখন একটী বড় সড় মেয়ে ছুটে এসে বাবাকে বললেন, 'দিন আমার কোলে আমি ওকে থামিয়ে দিচ্ছি।' তাঁকে দেখেই আর কথাটা শুনেই বাবা দিতে না দিতেই দাদা তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোথায় গেল কান্না, ছেলের হাসি খুসীর তখন কি ধূম! বাবা ত অবাক! এর পর ছেলে কিছুতেই দারোয়ানের কোলে

যাবেনা—বাপের কোলেও নয়! মহা মুস্কিল ত, কি করা যায়?

এমন সময় মেয়েটির বাবা এলেন; দুজনের ভেতর আগে থাকতেই নামের দিক দিয়ে চেনা-শোনা ছিল; শুধু তাই নয়, রেষারিষিও তলে তলে চলতো। অথচ দুজনের মধ্যে বয়সের তফাৎ ছিল ত্রিশ বৎসরেরও বেশী। পরিচয় হতে এখন দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক! সেই ঘাটের ওপরেই একটি শিশু ও একটি কিশোরীকে উপলক্ষ করে তাঁদের ভাব হয়ে গেল। সেই মেয়েটিই আমার মা; আর বুড়োটি আমার—মাতামহ।

সেই হল ঘটনার সূত্রপাত। আমার মার মত রূপসী সে সময় সে তল্লাটে কেউ ছিল না। শুধু রূপ কেন, মেয়েদের যে গুণগুলি থাকা উচিত, বিধাতা কোনটি থেকেই তাঁকে বঞ্চিত করেন নি। বাবা আমার দাদুকে স্ত্রীর সম্বন্ধে তাঁর সংসারের অশান্তির কথা সবই খুলে বললেন। দাদুও জানালেন, মেয়েটি তাঁর বড় হয়েছে, যোগ্য পাত্রও পাওয়া যাচ্ছে না, এইটিই এখন তাঁর মস্ত অশান্তি।

শেষে দুই পক্ষের অশান্তিটুকু দূর করবার জন্য দুই পক্ষের সম্মতিতে এই ব্যবস্থাই হল যে, কাশীতেই বিয়েটা চুপি চুপি হয়ে যাবে, কাক-চীলও জানতে পারবে না; তারপর দেশে গিয়ে

এপক্ষ খুব ঘটা করে ওপক্ষের বাড়ী থেকে বিবাহিতা বধূকে নিয়ে আসবে।

কিন্তু দেশে ফিরেই বাবা জানতে পারলেন, বুড়ো তাঁকে ভয়ঙ্কর রকম ঠকিয়েছেন। এই মেয়েটির ওপরের দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তিনি বংশজের ঘরে। সে হিসাবে তাঁর কুল গেছে ভেঙ্গে! অথচ, সে কথা ছাপিয়ে তিনি কিনা তাঁহার মত নিকষ কুলীনের সঙ্গে কায করেছেন! কি সর্ব্বনাশ! বল্লালী আমল থেকে তাঁর যে পৈতৃক কুল কৌলীন্যের আলোয় জ্বল জ্বল করছিল, তাকে তিনি দাবিয়ে দিলেন, ভেঙ্গে দিলেন! কুল যদি গেল, বাকড়ায় মুখুয্যে বংশের কি আর রহিল? তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের কাছে তিনি চেয়ে বসলেন এর কৈফিয়ৎ আর খেসারত।

মামলাবাজ শ্বশুর চিঠিখানা পড়েই মনে মনে হাসলেন। বুঝলেন, তার ভেতর এমন সব অব্যর্থ উপাদান আছে, একটা বড় রকমের মামলা গড়ে তোলবার পক্ষে যে গু[illegible] পর্য্যাপ্ত। তিনি তখন নিজের দিকটা বাঁচিয়ে পাকা হাতে জ[illegible]কে লিখলেন,—হাতের ঢিল আর সহীকরা চিঠি অগ্র পশ্চাৎ ভেবে ছুঁড়তে হয়। যাইহোক, চিঠিতে যে সব লিখেছ, সব বাজে। আমি সব পারি, কিন্তু ভণ্ডামী সইতে পারি না। তুমি লিখেছ, ভাঙ্গার ঘরে আমি দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে কুল ভেঙ্গেছি; আর, তোমার মত কুলীনের সঙ্গে কায করে তোমার কুলটিও আস্ত রাখিনি।

তোমার এই নালিশটা ঠিক উল্টো। আসল কুলীনের ঘরেই আমি তুই মেয়েকে দেবার সৌভাগ্য পেয়েছি। যেহেতু, কুলীনের নটা গুণের মধ্যে অন্ততঃ পাঁচটাও তাদের আছে। আর তুমি যে কৌলীন্যের অহঙ্কার করছো, এটা হচ্ছে নকল। কুলীনের কটা গুণ তোমার আছে? আমি জেনেছি, তুমি ত্রিসন্ধ্যা কর না, সুতরাং তুমি আচার ভ্রষ্ট; লঘুগুরু জ্ঞান তোমার নেই, অতএব তুমি অবিনয়ী; বেদ তুমি চোখেও দেখনি, উপনিষদ ছোঁওনি, শাস্ত্র চর্চ্চা কখন করনি, সুতরাং বিদ্যার গর্ব্বও তুমি করিতে পার না। প্রজার রক্তচোষা ছাড়া কোন প্রতিষ্ঠাও তোমার নেই। এর পর নিষ্ঠা বৃত্তি তপস্যা—কোনটা তোমার আছে?

চিঠি ত নয়, যেন তলোয়ারের খোঁচা! কিন্তু আমার বাবার রোখও চেপে গেল; লিখলেন—ও মেয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই রইল না।

দাদু লিখলেন,—কমলীকে ছাড়লেও কমলী ছাড়ে না। জান না, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ছাঁদনাতলায় দাঁড়িয়েছিলে, গাঁটছড়া বেঁধেছিলে, সম্বন্ধও রাখতে হবে। ঘটা করে বিয়ে না হলেও, কাশীর এমন ক'জন নামজাদা পণ্ডিত বিবাহ-বাসরে ছিলেন, যা ফ্যালনা নয়। তা ছাড়া বিয়ের পর বর ক'নের তোলা ফটো খানা আমি যত্ন করেই রেখেছি।

দিন কএক লেখালিখি চলল, কিন্তু মিটমাটের কোন লক্ষণ তখন দেখা গেল না। দাদুর মনেও বোধ হয় সেইটুকুই ইচ্ছা ছিল। তিনি তারপর ছাড়লেন তাঁর ব্রহ্মাস্ত্র—আদালতের ভয় দেখিয়ে উকীলের নোটিশ। কিন্তু এর পরই হঠাৎ সব গুলিয়ে গেলো। মা বেঁকে বসলেন, দাদুকে জানালেন, 'কিছুতেই আমি মামলা করতে দেব না।' দাদু অনেক বুঝিয়েও যখন তাঁকে কায়দা করতে পারলেননা, তখন শাসিয়ে বলে দিলেন—তাহলে তোমার সেই কুলীন পতিদেবতার চরণেই আশ্রয় নাও।

সেই দিনই মা চিঠি লিখে সব কথা জানালেন বাবাকে, তাঁর আশ্রয় চাইলেন। এমন কথাও লিখলেন 'যদি আমাকে ওখানে নিয়ে যেতে মাথা তোমার হেঁট হয়, যেখানে তোমার ইচ্ছা হয় আমাকে নিয়ে গিয়ে তুমি রাখ। আমি সেইখানেই থাকবো। আর, সাত দিনের ভেতর যদি এর বিহিত না কর, আমার পথ আমি খুঁজে নেব। তোমরা বিরূপ হলেও এক গাছা দড়িই আমাকে মুক্তি দেবে।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত দড়ির আশ্রয় তাঁকে নিতে হল না। বাবাই তাঁকে দয়া করে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু সেইভাবে আশ্রয়টুকু না নিলেই বোধ হয় মা আমার ভাল করতেন !

কলকেতার চাঁপাতলায় বাবার একখানা ছোট খাটো বাড়ী ছিল। মাকে তিনি সেই খানে এনে তুললেন। দাদুর সঙ্গে

সেই দিন থেকে সব সম্বন্ধই তাঁর কেটে গেল। দাদুও পণ করলেন, মেয়ের নাম তিনি মুখে আনবেন না, তার কথা মনে ভাববেন না, কেউ যদি কোন দিন তাঁর কাছে মেয়ে জামায়ের কথা তোলে, তিনি তাদের মুখদর্শনও করবেন না। তিনি জানলেন, মেয়ে তাঁর মরে গেছে।

বাবাও মনে মনে এই পণ করেই মাকে এনেছিলেন যে, স্বামীর যা কিছু কর্ত্তব্য বা দায়িত্ব, যদিও তিনি পালন করতে ত্রুটি করবেন না, কিন্তু তাঁর কুলমর্য্যাদার অনুরোধে এ বিবাহ তিনি গোপন রাখবেন। মাকেও শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তাঁর ছেলেপুলে হলে, তাদের ছাড়া আর কারুর কাছে তিনি কথাটা বলবেন না। বাবার রাশ নাম ছিল অনুকুল। মাকে তিনি এই নামের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেন। বল্লেন, 'বিয়ের সময়ও এই নামই ব্যবহার হয়েছিল! ডাক নামের সঙ্গে নাই বা সম্বন্ধ রইল। এই নামের সঙ্গেই জড়িয়ে থেকে তোমার সন্তানরা যদি একটা আলাদা বংশধারা রচতে চায়, তাতেই বা ক্ষতি কি! আমি যে ব্যবস্থা তোমাদের করে যাবো, তাতে কোন কষ্টই তাদের থাকবে না।' বাবার কোন কথাতেই মা আপত্তি কখনো করেন নি, এই প্রস্তাবেও করলেন না। কেবল তিনি বাবাকে লুকিয়ে একটি কায করেছিলেন, সেটি হচ্ছে—বিয়ের পরদিন তাঁদের দুজনের যে

ফটো খানা তোলা হয়েছিল, তার নীচে নিজের হাতে মা লিখে রেখেছিলেন—অনুকুল মুখোপাধ্যায় ও কাননবালা দেবীর বিবাহ-বাসরের ছবি। সেখানি মা শেষ পর্য্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলেন, শেষ নিশ্বাসটুকু ফেলবার আগে চুপি চুপি আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।

চাঁপাতলার বাড়ীতেই আমার চোখে পৃথিবীর আলোটি প্রথম পড়েছিল। বাবা সে দিন সেখানেই ছিলেন। আমি জন্মাতেই আহ্লাদ করে বলেছিলেন,—বাঃ! চুল চেরা ব্যবস্থা। এক ছেলে, এক মেয়ে; সবার অদৃষ্টে এমনটি হয় না।

মার কোন অভাবই বাবা রাখেন নি। রাঁধুনী, ঝি, চাকর, দরোয়ান—সবই এ বাড়ীতে ছিল। কিন্তু তা[illegible] কেউ ঘুনাক্ষরেও জানতো না যে, এই বাড়ীর মালিক বা[illegible]ট সংসারটির গৃহস্বামী অনুকুলবাবুই বাকড়া এষ্টেটের [illegible]মধন্য ভূস্বামী ভূপতি বাবু! বেশী কি, বাবার মরবার আগে আমি পর্য্যন্ত জানতুম না যে, বাকড়ার মুখুয্যে বাবুদের কুলকন্যার মর্য্যাদা আমার—তাঁদের রক্তধারা আমার দেহের ভিতরে!

আগেই বলেছি, আমার বড়মা ছিলেন চির রুগ্ন! দাদা যখন সাত বছরের ছেলে, তখন তাঁর সেই রোগ যক্ষায় দাঁড়ালো। ডাক্তার বললেন, একমাত্র বংশধরকে বাঁচাতে

হলে মায়ের কাছ থেকে তফাত করা উচিত। বাবার মনেও ঠিক এই সংসয় জেগেছিল। তিনি তখন ছেলেকে সরিয়ে সরাসরি আমার মায়ের কোলে এনে দিলেন। বললেন,— 'আমাদের ভেতর যোগসূত্র রচেছিল, এই ছেলেটি। সেদিন তোমার কোল ছাড়তে চায়নি। তারপর আর তাকে কোলে নেবার সুযোগও তোমার ঘটেনি; ওর মা এখন মরণাপন্ন। আমি একে তোমার হাতে দিচ্ছি, তুমি এর ভার নাও।'

মা বুঝি হাতে স্বর্গ পেলেন। আমি তখন খুব ছোট, হয় ত বছর পাঁচেকের মেয়েই হব! কিন্তু স্বপ্নের মত এখনও সে দিনটির কথা যেন একটু একটু মনে পড়ে। ছেলে পেয়ে মার কি আহ্লাদ, তার কি যত্ন! তেমন যত্ন বুঝি আমিও কোন দিন পাই নি। তবে তার জন্য আমার মনে একটি দিনের জন্য হিংসাও হয়নি—মার কাছেই তা পরে শুনেছিলুম। দাদাটি কিন্তু সেই বয়স থেকেই বাবার মতই গম্ভীর ছিলেন। বছর চারেক দাদা সেই বাড়ীতেই ছিলেন। ওদিকে তাঁর মায়ের আয়ুর তেলটুকু ফুরিয়ে এসেছিল, একদিন শেষ হয়ে গেল। শেষের কাযটুকু করাবার জন্য সেই যে তিনি ছেলেকে নিয়ে গেলেন, আর ফিরিয়ে আনলেন না। আমি প্রায়ই মাকে জিজ্ঞাসা করতুম আমার এই খেলার সঙ্গিটির কথা—কেন আসছে না মা, কবে আসবে? মা মুখখানা ভার করে বলতেন,

সে কি আমাদের যে আসবে? সে তার দেশে চলে গেছে। কিন্তু মায়ের কথায় আমার মনের ধোঁকা মোছে নি, সেই বয়সেই আমি ভাবতুম, ও যদি আমার দাদা হয়, পরের ছেলে হতে যাবে কেন?

বছরের পর বছর কেটে গেল। মায়ের একান্ত ইচ্ছায় আমার লেখা-পড়ার ব্যবস্থাটি ভাল করেই চলছিল। তিন তিনটে মাষ্টার পেছনে বাঁধা। এক জন পড়ান ইংরিজী, এক জন শেখান অঙ্ক, একজন দেন বাংলার পাঠ। আমি তখন কিশোরী, ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ি। মাষ্টারদের বাবাই দেখেশুনে রেখেছিলেন। বয়সে সবাই প্রবীণ।

একদিন পড়বার ঘরে বসে পণ্ডিত মশায়ের আসার প্রতীক্ষা করছি, তিনিই পড়াতেন বংলা। এমন সময় একটি ছেলে সেই ঘরে এসে ঢুকলো। পায়ের শব্দ শুনে দরজার দিকে চাইতেই অমনি চোখোচোখি হয়ে গেল। কি জানি কেন, স্কুলে যেতে কত ছেলেই ত নজরে পড়ে, কত রকমের কত সব ছেলে। কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখেই সমস্ত মনটা যেন কেমন করে উঠলো, চোখের সঙ্গে লজ্জার যে কি রকম ঝগড়া বেধে গেল সে আর কি বলবো! ছেলেটি কিন্তু তখন আমাকে দেখে একটুও ভড়কালো না বা থতমত খেলে না, বেশ সোজা কথায় বললে, 'যে পণ্ডিত মশাই তোমাকে পড়াতেন,

তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন পড়াবার জন্য। তাই আমি এসেছি।

লজ্জাটুকু কোন রকমে কাটিয়ে আমাকে তখন জিজ্ঞাসা করতে হল,—তাঁর কি হল?

ছেলেটি বললে,—তিনি দেশে গেছেন। ফিরতে মাস তিনেক দেরী হতে পারে। এই চিঠি তিনি দিয়েছেন, তোমার বাবার নামে; সব কথা এতেই আছে।

আমি বললুম,—বাবা ত এখানে নেই, তিনি পশ্চিমে গেছেন,—গয়ায়। তাঁরও ফিরতে দেরী হবে। তবে মা আছেন।

ছেলেটি বলিল,—বেশ তাঁকেই চিঠিখানা দিয়ে এসো। তিনি যদি রাজী হন, আমি তাহলে পড়াতে ব'সব।

মা রাজী হলেন। শুধু তাই নয়, ছেলেটির ব্যবহারে তিনি এতই মুগ্ধ হলেন যে, নিজের ছেলেকে যেমন করে আদর যত্ন করে, তেমনি করেই এই ছেলেটিকে ভালবেসে ফেললেন।

আর, আমার কথা মুখে কি বলবো? আমি যেন এই ছেলেটির সংস্পর্শে এমন একটা রাস্তায় এসে উঠলুম, সেখানে জঞ্জাল বলতে কিছুই নেই, ময়লা মোটেই চোখে পড়ে না, সবই ভালো, সবই সুন্দর, সমস্তটাই এমন পরিষ্কার—যেন তক্‌তক্‌ করছে। মা পাশের ঘরে বসে ছেলেটির পড়ানো শুনতেন;

যতক্ষণ পড়ার ঘরে এই মাষ্টারটির জিম্মায় আমাকে থাকতে হতো, মা সব কাজ ফেলে সেই ঘরেই যেন পাহারা দিতেন।

এদিকে হল কি, পণ্ডিত মশায়ের দেশ ছেড়ে আর ফেরা হল না। কাযেই তাঁর এই ছোকরা নিধিই তাঁর কাযে বাহাল হয়ে গেলেন। বাবা সে সময় মা'র পিণ্ডদিতে গয়ায় যান, তারপর গোটা ভারতবর্ষটাই ঘুরে আসেন। মা এরই মধ্যে চিঠি লিখে আমার এই নতুন মাষ্টারটির বাহাল মঞ্জুর করে নিয়েছিলেন। মাস পাঁচেক পরে বাবা যে সময় ফিরে এলেন, তখন গ্রীষ্মের ছুটি পড়েছিল। কাযেই মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নি। ছুটির পর আবার যখন তিনি এলেন, তখন বাবা জমিদারীর কাযে এমনই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে, বছর খানেক মাসের ভেতর দু তিন দিন ছাড়া তাঁর আসবার সুযোগ হত না। যে সময় আসতেন, আমার এই মাষ্টার তখন পড়িয়ে চলে যেতেন।

একদিন মাষ্টার মশাই আমাকে পড়িয়ে সবে মাত্র দেউড়ীর বাইরে গেছেন, এমন সময় বাবার গাড়ী এসে দাঁড়ালো। মাষ্টার মশাই পিছন ফিরে একবার গাড়ীখানার দিকে চেয়েই হন হন করে চলে গেলেন। গাড়ীতে যিনি বসেছিলেন, তিনি তাঁকে দেখতে পেলেন, কিন্তু মাষ্টার মশাই তাঁকে দেখেছিলেন কিনা কে জানে! একটু পরেই বাবা মুখখানা হাঁড়ির মত করে আমার

পড়বার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যে ছোকরা এইমাত্র বেরিয়ে গেল, পণ্ডিত মশায়ের জায়গায় ঐ বুঝি তোমাকে পড়াতে আসে?

বাবার মুখ দেখে আর প্রশ্নটার সুর শুনে আমি যেন চমকে উঠলুম। আস্তে আস্তে মুখখানা তুলে বললুম,—হ্যাঁ।

আর কিছু না বলেই তিনি সমস্ত সিঁড়িগুলো কাঁপিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। ভয়ে আমার বুকখানা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো। মনে প্রশ্ন উঠল,—হল কি বাবার? সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা জানবার একটা কৌতূহলও অদম্য হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে ওপরে উঠলুম। হঠাৎ মার কথা কানে এল; বোধহয় ছেলেটির সম্বন্ধে বাবা কোন প্রশ্ন তাঁকে করেছিলেন। মা তখন বলছিলেন,—খাসা ছেলে। আমি ত বরাবরই সমস্তক্ষণ পাসের ঘরে বসে থাকি, কিন্তু একটি দিনের জন্য ওকে বেচাল হতে দেখিনি। মেয়ে বরং আজে বাজে কথা তুলে গল্প করতে লাগল, কিন্তু ছেলেটি অমনি ব'লে উঠে, এসব কথা রেখে পড়ার দিকে মন দাও।

মার কথার উত্তরে বাবার মুখের শুধু একটি কথা শুনলুম,—বটে!

কিন্তু সে কথাটা যে বন্দুকের গুলীর মত মায়ের বুকে বিঁধেছে, তা বাইরে থেকেই বুঝতে পারলুম মার পরের কথায়; মা যখন

বললেন,—কিন্তু আমি ত ওর কথা তোমাকে চিঠিতেই লিখেছিলুম!

বাবা বেশ ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলেন,—চিঠিতে তুমি কি লিখেছিলে যে, ওর নাম দীননাথ চট্টোপাধ্যায়, আর ওর বাড়ী বাকরায়?

মা জবাব দিলেন,—না, তা আমি লিখিনি, আর তখন তা জানিও নি।

বাবা বললেন,—জানলেও জানাতে চাওনি। কিন্তু যখনই তুমি জেনেছিলে, ওর বাড়ী বাকরায়, তখনই তোমার জানানো উচিত ছিল। যাইহোক, এরপর এবাড়ীর দরজা ওর জন্য বন্ধ হয়ে গেল। অন্য কোন পণ্ডিত কাল থেকে মেয়েগুলীকে পড়াবে জেনে রাখো।

কথাগুলি শুনে টলতে টলতে আমি পড়বার ঘরে এসে বসলুম। আমার মনে হচ্ছিল—সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বুঝি ঘুচে গেল,—সব দিক দিয়ে পরিবেষ্টন করে উঠেছে একটা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর, তার অন্তরালে আমি বন্দিনী।

এর পরের কথা আমি আর বিস্তার করে বলতে চাই না, শুধু এই টুকুই জানাচ্ছি যে দীননাথবাবু আমাকে আর পড়াতে আসেন নি। তবে তাঁর সন্ধান নিয়ে তাঁর উদ্দেশে চিঠিবাজী

করতে আমার পক্ষ থেকে ত্রুটি হয় নি। কিন্তু কোন সাড়াই তিনি দেন নি।

হঠাৎ একদিন খবরের কাগজে দেখলুম, বাকড়ার বিখ্যাত ভূস্বামী ভূপতি বাবু হার্টফেল করে মারা গেছেন। বাকড়া নামটা বাবার মুখেই শুনেছিলুম, দীননাথ বাবুর বাড়ী সেইখানে, তাই তাঁর নামের সঙ্গে নামটাও বুঝি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলুম। কাগজখানা মাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—ভূপতি বাবু কে মা?

খবরটা পড়েই মা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। আমি এক বারে কাঠ! হল কি? কে এই ভূপতি বাবু!

শোকের বেগ একটু নরম হলে মা আমাকে কোলে টেনে নিয়ে সব কথাই আমাকে শুনিয়ে দিলেন। সেই দিন জানলুম আমি কে; আর—দীননাথ বাবুকে ওভাবে তাড়াবার কারণটি কি! কিন্তু মনটা আমার ঘৃণায় রাগে যেন বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠলো—চুলোয় যাক সব, দীননাথ বাবুকে ফিরিয়ে আনা চাই।

বাকড়া থেকে কিন্তু মার কাছে কোন খবরই এল না, দাদাটি পর্য্যন্ত চুপ! মাও চুপ করে তাঁর যেটুকু কর্ত্তব্য, বুক বেঁধে তাই করতে লেগে গেলেন। আমি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলুম না, দুখানা চিঠি লিখে ফেলুম। এক খানা লিখলুম দীননাথ বাবুকে—আমি পিতৃহারা, মা শোকাতুরা; একবার আসবেন। আর একখানা লিখলুম দাদাকে—অতীতের গুপ্ত কথাগুলো সংক্ষেপে

লিখে জানালুম যে, কাষের আগেই আমরা গিয়ে পৌছচ্ছি, প্রস্তুত থাকবেন।

চিঠির ফল হল অব্যর্থ। পরদিনই দাদা গলায় কাছা বেধে ছুটে এলেন। দেখলুম, বাবার মুখের আর মনের ছাপ তাঁর মুখে আর কথায় হুবহু পড়েছে। চিঠিখানা দেখিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলেন—কে লিখেছে চিঠি? মা চিঠির কথা জানতেন না, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। আমি মুখখানা শক্ত করে জবাব দিলুম—লিখেছি আমি। মা বললেন—কৈ, আমি ত জানি না, কি চিঠি দেখি! চিঠি খানা নিয়ে মা পড়তে লাগলেন। সেই অবসরে দাদা শাসিয়ে শুনিয়ে দিলেন—সেখানে গেলে দরজা থেকেই ফিরে আসতে হবে, বলে দিলুম।

আমি রাগের মাথায় যেই কথাটার জবাব দিতে যাবো, মা খপ করে মুখখানা আমার চেপে দাদার দিকে চেয়ে বললেন,—একদিন আর সকলের কোল ছেড়ে আমার কোলেই তুই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলি, চারটি বছর আমি যে তোকে কোলের ছেলের মতই মানুষ করেছিলুম রে, মা বলতে তুই যে তখন অজ্ঞান হতিস মহী, আজ তোর মুখে এই কথা? পেটে না ধরলেও যে আর সব দিক দিয়ে আমি তোর মা!

শুনে দাদা মুখখানা মচকিয়ে মাকে শুনিয়ে দিলেন,—তুমি আমার পুতনা-মা। বাবা যে সম্বন্ধই তোমার সঙ্গে রাখুন,

আমি তা স্বীকার করব না, বাবাও কোন কথা আমাকে বলে যান নি। পাছে সেখানে গিয়ে তোমরা একটা কেলেঙ্কারী বাধাও, তাই আমাকে আসতে হয়েছে। এর পরও যদি যাও, সে দায়িত্ব তোমাদের।

মা বললেন,—আমার মেয়ে পাগল হয়েছে বলে আমি ত হইনি মহী। তিনি বেঁচে থাকতে সে ভীটের ত্রিসীমানায়ও কোন দিন যাইনি, আজ তাঁর শেষের কাজ করতে যাব সেখানে? এ ধারণা তোমার মনে কেন হল বাবা! ভয় নেই, তিনি থাকতেই আমি যখন তাঁর কুলের কাঁটা হয়েছিলুম, তিনি না থাকলেও সে কাঁটা কোন দিক দিয়েই তোমার গায়ে ফুটবে না বাবা! তাঁর যা কায, আমিই এখানে করব।

সে তোমাদের ইচ্ছা।—এই কথা বলেই দাদা চলে গেলেন। কিন্তু আমি তখনই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, এই কাঁটা আমিই একদিন এমন করে ফুটিয়ে দেব, যার জ্বালা তোমাকে পাগল করে তুলবে দাদা!

সেদিনই এলেন দীননাথ বাবু। তাঁকে দেখেই আমি আহ্লাদে কেঁদে উঠে চেঁচিয়ে বলেছিলুম,—মা, মাষ্টার মশাই এসেছেন। মার মনের শোকও তখন উথ্‌লে উঠেছিল, অশ্রু তখন চোখের শাসন বুঝি মানছিল না। শেষে বাবার শেষের সব কাযই এমন করে শেষ হয়ে গেল—বুঝি বাকড়ার প্যালেসেও

তা হয় নি। যা কিছু ব্যবস্থা সবই করেছিলেন দীননাথ বাবু। আর তাতে যে নতুনত্বটুকু ফুটে উঠেছিল, সবাই ধন্য ধন্য না করে পারে নি। মৃতের আত্মাকে তৃপ্তি দিতে সে দিন ভুরি ভোজে যারা পরিতৃপ্ত হয়েছিল—দীননাথ বাবুই তাদের খুঁজে খুঁজে ডেকে এনেছিলেন, ছেলে পুলে নিয়ে কি আনন্দ করেই তারা খেয়েছিল। অবশ্য, তাদের ভেতর বড়লোক ছিল না, নামী ছিল না, সবাই তারা গরীব গৃহস্থ। লোক খাইয়ে এমন আনন্দ যে হতে পারে, এর আগে তা কোনদিন জানি নি।

কায কর্ম্ম চুকে গেলে হঠাৎ একদিন শুনলুম, মা দীননাথ বাবুকে কি সব বলছেন। অনেকক্ষণ ধরেই তাদের কথা চলেছে। নিজের নামটাও বার বার কানে বাজতে লাগলো। খুব সন্তর্পণে দরজার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে যে প্রস্তাব মার মুখে শুনলুম, সমস্ত বুকটা তাতে দুলে উঠলো! মা কি তাহলে মেয়ের মনের গোপন আকাঙ্ক্ষাটুকু অনুভূতি দিয়েই জেনেছিলেন? তাই কি তিনি দীননাথ বাবুর হাতখানি ধরে তখন বলছিলেন,—পাগলীকে তোমার নিতে হবে বাবা! কিন্তু শ্রদ্ধার সঙ্গে আস্তে আস্তে হাত দুখানি ছাড়িয়ে নিয়ে দীননাথ বাবু তখন যে উত্তর দিলেন, তাতে মার মুখখানা বন্ধ হয়ে গেল, আর আমার মনে হল যে, পা দুখানা বুঝি দেহটাকে আর বইতে পারছে না, টলতে টলতে নিজের ঘরে গিয়ে বিছানার ওপর উপুঁড় হয়ে পড়লুম, চোখের

জলে বালিসটা বুঝি ভিজে গেল; কেবলই দীননাথ বাবুর কথাগুলো কানের ভিতর তখনও যেন ঝঙ্কার দিচ্ছিল—'নিশা আমার পাগলী বোন। যখনই ওর শিক্ষার ভার আমাকে দেন, আমি বড় ভাই আর ও আমার বোন—এই ধারণাই যে মনটার ভেতর চালিয়ে দিয়েছিলুম না, সে ত আর বদলাতে পারে না। ওপ্রস্তাব তুলে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না!'

মাস খানেক পরেই হঠাৎ মাও মারা পড়লেন। সংসারে রইলুম আমি একা। খবর পেয়েই দীননাথ বাবু ছুটে এলেন। মার কাযও তাঁর সাহায্যে ভাল ভাবেই হয়ে গেল। আমার কিন্তু সে সবের দিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না, কাযের ভেতরে আমি যেন শুধু দীননাথ বাবুর পিছু পিছু ছায়ার মতন ঘুরছিলুম। নিজের এই রূপ অভিভাবক হীন অবস্থা আর প্রচুর টাকার প্রলোভন কি এই মানুষটির ধারণাটুকু বদলাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়?

পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রবীণ পণ্ডিত তখন আমাদের বাড়ীতে থেকেই লেখাশুনা করতেন। মা তাঁকে কাকা বলে ডাকতেন, সে হিসাবে তিনি হয়েছিলেন দাদাবাবু। ইংরাজী ও সংস্কৃতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য। সংসারে আপনার বলতে এক বিধবা বোন ছিলেন, আমার মায়ের বয়সীই হবেন। মা তাঁদের দুজনকেই আমাদের সংসারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। দাদাবাবু সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনাও করতেন।

অজানা অতিথি

ময়ের কায শেষ হয়ে গেলে দীননাথ বাবু আমাকে ডেকে বললেন,—আমি তাহলে চললুম নিশা।

আমি বললুম,—দাঁড়ান একটু, কথা আছে।

কথাটা শোনাতে তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে এলুম। তিনি একটু বিস্ময়ের ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কি বল ত?

মুখে কিছু না ব'লে সুগন্ধ এসেন্সসিক্ত একখানা রেশমী রুমালে জড়ানো এক তাড়া ব্যাঙ্ক নোট তাঁর পায়ের কাছে রেখে মাথাটিও সেখানে ঠেকিয়ে দিলুম।

মুখখানা গম্ভীর করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কি এ?

বললুল,—কিঞ্চিৎ পাথেয়। কথার সঙ্গে সঙ্গে মুখের হাসি ও চোখের কটাক্ষ বুঝি তীক্ষ্ণ হয়েই ফুটেছিল। তিনি কিন্তু সহজ-কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করলেন,—কত আছে?

বললুম—আপাতত হাজার।

—তারপর?

—সর্ব্বস্ব।

—উদ্দেশ্য?

এতগুলো কথায় সঙ্কোচ তখন সরে গিয়েছিল; বললুম—খুলে বলতে হবে? এতই কি আপনি বোকা? মানব মনের সাইকলজী সত্যিই কি আপনি পড়েন নি দীননাথ বাবু?

এই প্রথম তাঁকে নাম ধরে ডাকলুম। কিন্তু তার উত্তর

পেলুম—পড়েছি বইকি, কিন্তু তাতে শিখেছি—আমি তোমার দাদা, তুমি আমার বোন। আর এখানে আসবার পাথেয় হচ্ছে—খাঁটি মন।

আর কোন কথা না বলে, তিনি একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তার পর আর একটি কথা না বলে এত দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন যে, আমি পেছু নিয়েও তাঁকে ধরতে পারলুম না। এর পর কত চিঠিই তাঁকে লিখেছিলুম, কিন্তু বৃথা; একখানার জবাবও তিনি দেন নি, একদিনের জন্যও আসেন নি।

তখন আমার মাথায় একটা দুষ্টুমির বুদ্ধি এলো। সোনাগাছির ঐ বাড়ী থেকে একটা মেয়ে আমাদের কলেজে পড়তে যেত। তার সঙ্গে পরামর্শ করে ঐ বাড়ীর একখানা ঘর ভাড়া নিই। তারপর একটা দিন ঠিক করে দীননাথ বাবুকে লিখ্‌লুম, —আপনার জন্যই আমাকে এই কদর্য্য স্থানে আসতে হয়েছে। ঐ দিন রাত্রি আটটা পর্য্যন্ত আপনার প্রতীক্ষা করব; যদি না আসেন, শেষে এই বিপথে পাড়ী দেব। আমার অনুমান ঠিক হয়েছিল। দীননাথ বাবু ঠিক সময়েই এলেন এবং একটি ঘণ্টা সেখানে যে পরামর্শ আমাকে দিলেন, আমার চোখ তাতে খুলে গেলো, আমি গলায় কাপড় দিয়ে সেইখানেই তাঁকে গড় করে বলেছিলুম—সত্যিই আজ থেকে তুমি আমার দাদা, আর আমি ছোট বোন!

তারপর আমার বাবা যে বাড়ী ও টাকাকড়ি আমার মাকে দিয়ে যান, সেটার ওপর দাদা যখন দাবী করলেন, তখন দেবীপুরের রাজকন্যার সঙ্গে দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে জেনেই, আমি মরিয়া হয়ে নালিশ করতে আসি। এই আমার ইতিহাস। এর কিছু মিথ্যা নয়। প্রমাণও অনেক আছে।

আট

রাজা বাহাদুর মহীপতির দিকে চাহিয়া বেশ স্নিগ্ধস্বরেই প্রশ্ন করিলেন,—মহীপতি বাবু, তুমি কিছু বলবে ?

মহীপতি কহিল,—আমি এখনও পাগল হইনি।

রাজা বাহাদুর কহিলেন,—কিন্তু এই মেয়েটি আগেই স্বীকার করেছে যে, ছেলে বেলা থেকে সে ভারি চঞ্চল আর ছটফটে বলে ওর বাবাই ওর নাম রেখেছিলেন, পাগলী। কিন্তু তাহলেও মিছে কথা বড় একটা ও বলে না, হাজার হোক, দীননাথের ছাত্রী কিনা! যাক, তোমাকে আমি এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন আর করব না এবং সেটা উচিতও নয়। তবে দীননাথের বিরুদ্ধে যে অপবাদ চক্রান্তের দ্বারায় রটনা করা হয়েছিল সেটা টিকলো না ; আর কিরণপদ যে সাক্ষী সাবুদ তোড়জোড় করে এনেছিল, সে সব ও কেঁচে গেলো।

কৃষ্ণা এই সময় মুখখানা ভার করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শক্তিপদর দৃষ্টি সহসা সেই দিকে পড়িল। তিনি গম্ভীর গলায় কহিলেন,—যেয়োনা তুমি, তোমার বিরুদ্ধেও একটা নালীশ আছে।

পরক্ষণেই শক্তিপদ কণ্ঠের স্বর আরও উচ্চগ্রামে তুলিয়া ডাকিলেন,—মলজী মাড়োয়ারী।

একটু পরেই আদালতের সাক্ষীর মত স্পন্দিত বক্ষে কম্পিত

পরে মলজী সভাগৃহে প্রবেশ করিল এবং আভূমি নত হইয়া কহি
—হাজীর !

শক্তিপদ প্রশ্ন করিলেন,—তুমি যে কৃষ্ণপ্রিয়া বাঈজীর না
লম্বা দরখাস্ত করেছ, সে মেয়েটি এখানে আছে ?

মলজী কৃষ্ণার দিকে হাতখানা বাড়াইয়া ব্যগ্রভাবে কহিল,—
জী-হুজুর ঐ আওরত !

শক্তিপদ কহিলেন,—কিন্তু এই আওরতের মোকাম যে সোনা
গাছিতে, লিলুয়ায় ত নয়।

মলজী বিগলিত কণ্ঠে কহিল,—ঝুটবাত হুজুর—ঝুট ! বিল
কুল ঝুট। সাত বছর ধরে ও লোক হামিলোকের লিলুয়ার
মোকামে ঘর বসতি করিয়ে আছে। যদি বোলে যে হামিলোকের
বাত মিছে, হুজুর সরে জামীনে তদারক করিলে বিলকুল মালুম
হোবেক।

রাজা বাহাদুর কহিলেন,—কৃষ্ণাবাঈ, তোমার সব চালাকি
ধরা পড়ে গিয়েছে। ভেবেছিলে, চালাকিতে সব মাত করে দেবে
কিন্তু তা হয় না। মলজীর সঙ্গে যে দাগাবাজী করেছ, মলজী
দরখাস্ত পড়ে আমি তা স্পষ্টই বুঝেছি। কিরণপদকে
বিষিশত্তর ও কিরেছ বুঝি— দীননাথকেও দলবার চেষ্টায় ছিলে
এইবার তোমার বিচারের পালা এসেছে।